প্রথম প্রকাশ
পৌষ ১৩৬৩

প্রকাশক
সাহিত্য সমবায় লিমিটেড-এর পক্ষে
দীপেন রায়
৮৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

মুদ্রক
পৃথ্বীশ সাহা
অমি প্রেস
৭৫ পটলডাঙ্গা স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী ঃ জয়ন্ত ঘোষ

শাশ্বত যুবসমাজের উদ্দেশে
যারা স্বপ্ন দেখে সুস্থ ও সুন্দর পৃথিবীর

# সূচীপত্র

# নেরুদার কবিকৃতি ও অনুবাদ প্রসঙ্গে

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর এই পৃথিবী দেশে দেশে মুক্তিকামী মানুষের বাঁচার লড়াই ও শান্তির লড়াই-এর এক অনন্য ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে; এর সম্যক উপলব্ধি দুরূহ, কেননা তা সমসাময়িক। এই ইতিহাসের পশ্চাৎপটে আছে সমাজ-তান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমে ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দে সোভিয়েত সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা বা কৃষক-শ্রমিকরাজ কায়েম হওয়া। তার পরের ইতিহাস আরও দ্রুতগামী। নানা উত্থান-পতন, পথের বিভিন্নতা, ভ্রান্তি ও বিরোধ সত্ত্বেও দেশ-দেশান্তরে মুক্তিকামী মানুষের সমবেত কণ্ঠস্বরে গণজীবনের অপ্রতিহত অগ্রগতি ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার কামনা-বাসনা ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত।

মুক্তিসংগ্রামের এই অগ্রগতির নামই প্রগতি। শিল্পে, সাহিত্যে, দর্শনে, রাজ-নৈতিক চিন্তাদর্শে তথা সামগ্রিক জীবনবোধের মধ্যেও এটি অনুস্যূত। এই প্রগতির এক অনন্য প্রতিনিধি—কবি পাবলো নেরুদা। সুদূর লাতিন আমেরিকার স্বাধীন রাষ্ট্র চিলির সন্তান হয়েও তিনি এ-যুগের বিশ্বকবি রূপে স্বীকৃত। নেরুদার কর্মবহুল বর্ণাঢ্য জীবনের ইতিহাস সম্পর্কে অবহিত এ-যুগের সভ্য জগতের প্রায় প্রতিটি মানুষ। এই অনুবাদ গ্রন্থের পৃষ্ঠপট রূপে সেই ইতিহাসের নির্বাচিত কিছু তথ্যের আলোচনা প্রাসঙ্গিক মনে করি। কারণ, তাঁর কবিতার সমীক্ষণ ও যথাযথ মূল্যায়নে প্রভূত সহায়তা করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের এইসব ঘটনাবলী। প্রকৃতপক্ষে, নেরুদা শুধুমাত্র একটি ব্যক্তিই নন, শুধু একজন কবিই নন, নেরুদা এক প্রদীপ্ত অনুপ্রেরণা।

• কবি নেরুদার কাব্যের ফসল যেমন তার কর্মজীবনের সূত্রে যুক্ত, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের নানা দেশের ক্ষেত্র-সঞ্জাত তেমনি তা আহরিত হয়েছে নানাদেশের গণজীবনের হৃদস্পন্দন থেকে। আত্মজীবনীর স্মৃতি-সম্বলিত কবিতাগুলি—যথা, স্পেনীয় কবিতাগুচ্ছ, ভিয়েৎনাম স্মৃতিমথিত 'থেমে যায় নদী কলতান' বা 'সমুদ্রের গান' ইত্যাদি ছাড়াও বহু কবিতার মধ্যেই গোপনে পদসঞ্চার ঘটেছে সেই ভ্রাম্যমান মানুষটির কবিচিত্তের, যা গঠিত হয়েছে কর্মসূত্রে বিদেশবাস ও সেই উপলক্ষে সুখ-দুঃখের, সংগ্রাম ও জয়-পরাজয়ের বিচিত্র অভিজ্ঞতার সঞ্চয়ে। বোক্কাচিও, পেত্রার্কা, চসার ইত্যাদি কবিরা এককালে তাঁদের কাব্যের ফসল সমৃদ্ধ করেছিলেন বিদেশ পরিক্রমার মাধ্যমে এবং সৃষ্টি করেছিলেন তাঁদের সমসাময়িক কবিতায় নবযুগ। নেরুদা সেই হিসাবে তাঁদের উত্তরসূরী, যদিও তাঁর ভ্রমণে তিনি প্রত্যক্ষ অংশীদার হয়েছিলেন দেশান্তরের মানুষের সুখ-দুঃখের, অনুভব করেছিলেন বিশ্বভ্রাতৃত্বের বন্ধন। নেরুদার স্মৃতিচারণ, যা বিধৃত হয়েছে তাঁর বিখ্যাত

Memoirs-এ, অনেক ক্ষেত্রে নেরুদার কবিতাও ঐ স্মৃতিগুলিরই কাব্যভাষ্য।

ব্যক্তিগত জীবন ও কবিজীবনের এই অনন্য অভিন্নতা তাঁর কাব্যে পরিব্যাপ্ত এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত—'বিশটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' থেকে শেষ পর্যায়ের 'সমুদ্রের গান' অবধি। এখানে একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, একটি স্পর্শকাতর মন, একটি ব্যগ্রব্যাকুল হৃদয় উন্মুখ হয়ে আছে মানব নামক এক বিশাল সমুদ্রে নিজেকে মিলিয়ে দিতে ও তার তরঙ্গের ঘাত-প্রতিঘাতে স্নান করতে।

নেরুদার এই 'মানুষ' একদিকে যেমন শ্রমিক-কৃষক, দীন-দরিদ্র, নির্যাতিত ও লাঞ্ছিত সাধারণ মানুষ, তেমনি অন্যদিকে তা বিশ্বপ্রকৃতির অভিন্ন সত্তা। পর্বতে-মরুতে, মাটিতে-শিকড়ে, জলে-স্থলে, অরণ্যের ফুল ও ফলে, শীত ও বসন্তে, ভূত-ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের ব্যাপকতায় এ মানুষকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন এক প্রাণবন্ত রূপাদর্শে। জাত কবিদের রীতিই এই—একটা দৃষ্টির সামগ্রিকতা ও অখণ্ডতা ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের অন্তর্লোকে এবং তা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁদের সৃজনে। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে অতীন্দ্রিয়বাদ অথবা অবাস্তব স্বপ্নপ্রয়াণ ইত্যাদি নাম দিলে তাতে জীবন বিমুখতারই পরিচয় দেওয়া হবে। পঞ্চাশের দশকে রচিত পরিণত কবির 'নাম, নাম আর নাম' কবিতাটির শেষ অংশটুকু উদ্ধৃত করলেই বক্তব্যটা পরিষ্কার হতে পারে :

আমার একটা ঝোঁক আছে তালগোল পাকানোর<br>
তাদের যুক্ত করে নবজাত দেখতে<br>
তাদের গুলিয়ে দিয়ে নিরাবরণ করতে<br>
যতক্ষণ না সারা বিশ্বের যত আলো<br>
মিশে যায় মহাসমুদ্রের এককত্বে<br>
এক উদার, বিশাল সমগ্রতা<br>
স্ফুটরত সতেজ সৌরভ।

বিশ্বমুখী চেতনার অশান্ত এই কবি তাঁর কৈশোরে যখন দক্ষিণ চিলির সান্তিয়াগোর তেমিউকো অঞ্চলে এক নিঃসঙ্গ ছাত্র তখনই তাঁর চিত্ত আকুল হয়েছে ক্ষুদ্র এই গণ্ডীর বাইরে আসার জন্যে ; আর বোধহয় সেইজন্যই নিজের তদানীন্তন নাম নেফ্‌তালি রিকার্ডো রিয়েসের পরিবর্তে খ্যাতিমান চেক্ লেখক ইয়ান নেরুদার পদবী-অংশটুকু গ্রহণ করে তিনি হতে চেয়েছেন পাবলো নেরুদা। আপন হতে বেরিয়ে এসে বাইরে দাঁড়াতে চাওয়ার এটি একটি সুস্পষ্ট পদক্ষেপ—এক কিশোরের স্বপ্ন।

নেরুদা কবিতা লেখেন, অথচ ১৯২৪-এ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'বিশটি প্রেমের কবিতা ও একটি হতাশার গান' লেখার পরেও তাঁর স্বীকৃতির প্রশ্ন নেই ; কিন্তু ১৯৩২-এ ঐ একই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশের সময় থেকেই কবি পেলেন জাতীয় স্বীকৃতি—তখন তার বয়স মাত্র আটাশ বছর। জনপ্রিয় এই গ্রন্থের কবিতাগুলি

মানুষের মুখে মুখে ফিরলেও সেগুলির সজীবতা অম্লান, কেননা সেগুলি এক সজীব মনেরই ফসল। উৎসাহী কিছু নেরুদাপ্রেমী এই পর্যায়ের কবিতাগুলির মধ্যে নিছক নন্দনতাত্ত্বিক মানসিকতারই সাক্ষাৎ পেয়েছেন, কিন্তু এর অনেকগুলি কবিতা থেকে পরবর্তী পরিণত নেরুদাকে স্বতন্ত্র করে দেখলে এই কবিতাগুলির প্রতি অবিচারই করা হয়। কবিতাগুলির মধ্যে যে 'নারী' ছায়া ফেলে, সে শুধু শরীরসর্বস্ব এক প্রেরণা—এরূপ ধারণা শুধু অজ্ঞতাই নয়, সাহিত্যবোধেও জন্মান্ধতা। এ নারীর রহস্য জড়িয়ে আছে ওতপ্রোতভাবে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে—মহাবিশ্বের দ্যোতনায়। 'তুমি প্রতিদিন খেলা কর' কবিতাটি এরি একটি দৃষ্টান্ত :

দক্ষিণের তারাদের কোলে কে লেখে তোমার নাম অস্পষ্ট অক্ষরে ?
দেখি আমি মনে পড়ে কিনা তোমাকে যেমন ছিলে অস্তিত্বের আগে।

'দেশে দেশে মোর ঘর আছে আমি সেই ঘর মরি খুঁজিয়া'—এই উপলব্ধি থেকে অশান্ত কবির জীবনে এতদিন পরে এলো চিলির গণ্ডী পেরিয়ে দেশান্তরে পাড়ি জমানোর পালা। একটি নির্দিষ্ট ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখার অস্থিরতার কথা কবি অকপটে বর্ণনা করেছেন তাঁর স্মৃতিচারণে—Memoirs-এ। চিলির বিদেশমন্ত্রকের দপ্তর থেকে তিনি সংগ্রহ করলেন সুদূর প্রাচ্যের রেঙ্গুনে বাণিজ্যদূতের নিয়োগপত্র। ১৯২৭ সালের জুন মাসে যাত্রা শুরু হল সমুদ্রপথে। রেঙ্গুন, কলোম্বো, জাভা প্রভৃতি প্রাচ্যের দেশগুলিতে এরপর কবির কেটেছে পাঁচটি বছর। কাব্যজীবনে এই দিনগুলি চিহ্নিত হয়ে আছে এক বিচ্ছিন্নতার বেদনায়। তাঁর পরিচিত কথ্য স্প্যানিশ ভাষার পৃথিবী থেকে এ যেন এক নির্বাসন। তাছাড়া, তাঁর পদগৌরব ও আর্থিক দৈন্যের অসম সমন্বয়ে এক সকৌতুক বেদনার ঘটনাবহুল জীবন ছিল এই দিনগুলিতে। ১৯৬৭ সালে রচিত 'থেমে যায় নদী কলতান' কবিতায় তিনি ১৯২৮-এ পথভ্রষ্ট হয়ে ভিয়েৎনাম পৌঁছানোর যে উপাখ্যানটির অবতারণা করেছেন সেখানে উল্লেখ আছে ভাষা-সম্পর্কিত এই বেদনা বোধের কথা : যেমন, 'বিশ বছরের যুবক, মৃত্যুর অপেক্ষায়, বাক্‌শক্তিহীন সংকোচনে।'

১৯৩৩ সালে প্রকাশিত কবির কবিতাগুচ্ছ 'মর্তের আবাস'-এর কবিতাগুলির মধ্যে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে সেই বিচ্ছিন্নতাবোধ। চারিধারের সবকিছুই অসংবদ্ধ, বিক্ষিপ্ত—যেন প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে এক অনিবার্য পরিণতির দিকে—যার নাম মৃত্যু। 'ঐক্য' কবিতাটি অনবদ্য ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে এই বিচ্ছিন্নতাবোধ :

আমি ধ্যানমগ্ন হই ঋতুর বিস্তারের মধ্যে—নিঃসঙ্গ, একাকী,
কেন্দ্রগত, শব্দহীন ভূগোল পরিবেষ্টিত ;
আকাশ থেকে নামে এক অসমাপ্ত তাপমাত্রা,
আমাকে ঘিরে জড়ো হয় এলোমেলো ঐক্যের এক চূড়ান্ত সাম্রাজ্য।

এই কবিতাগুলির সার্থকতা সম্বন্ধে পরবর্তীকালে কবির নিজের মনেও প্রশ্ন জেগেছে, কেননা এগুলি নেতিবাচক। রেঙ্গুন-যাত্রাকে স্মৃতিচারণে বর্ণনা করতে

গিয়ে কবি বলেছেন, 'পৃথিবীর মানচিত্রের পূর্বদিকে যে একটা বিরাট গহ্বর—সেই পূর্ব দেশের যাত্রী আমি।' এই 'বিরাট গহ্বর' কথাটির মধ্যে কবির অলক্ষ্যে ধ্বনিত হয়েছে এক নিয়তির পরিহাস, এক হতাশার সুর, যদিও আনন্দ সহকারেই তিনি কথাটি বলেছিলেন বন্ধুদের কাছে। আধুনিক কালের কোন কোন সমালোচক এই কবিতাগুলির মধ্যেই কিন্তু লক্ষ্য করেছেন এক বিশেষ তাৎপর্য—এ-যুগের ব্যক্তিমানসের দুরপনেয় বিচ্ছিন্নতাবোধ—Sense of alienation—এবং সেই হিসাবে যুগের সার্থক প্রতিচ্ছবি। এই অর্থহীন অস্তিত্ববোধ প্রকাশ পেয়েছে আরও একটি কবিতার বহুছত্রে :

কি জানি কেমন এক
ক্লান্তি যেন দুপায়ে জড়ায়
ক্লান্ত আমি নখগুলো নিয়ে, ক্লান্ত চুল নিয়ে,
আমাকে ক্লান্ত করে আপনার ছায়া।
আমি এক ক্লান্ত নর, নর আমি তাই।

কিন্তু এই হতাশার গহ্বরের মধ্যেও এই একই কবিতায় যেন ধ্বনিত হয়েছে এক পৌরুষ—যা দৃপ্ত কণ্ঠে অস্বীকার করছে অনিবার্য মানবিক নিয়তিকে :

আমি চাই না সঞ্চিত এই দুর্ভাগ্যের উত্তরাধিকার
অনুবৃত্তি চাই না শিকড় বা কবরের মত
নিঃসঙ্গ সুড়ঙ্গ পথ, শবদেহ সমাকীর্ণ ভূগর্ভস্থ ঘরের মতন,
অনঢ়-কঠিন হিমে, যন্ত্রণায় মৃতপ্রায় যেন।

'বিরাট গহ্বর' থেকে বেরিয়ে এলেন কবি ১৯৩৩-এ, যে বছর তিনি বাণিজ্য-দূত নিযুক্ত হলেন বুয়েনস্ এয়ার্সে। এখানেই তিনি পেলেন এক নতুন দিগন্তের দিশা যখন এই বছরের অক্টোবরে তাঁর পরিচয় হল কবি ফ্রেদেরিকো গারসিয়া লোরকার সঙ্গে এবং সে পরিচয় রূপান্তরিত হল প্রগাঢ় বন্ধুত্বে। এই সময়েই তার বন্ধুত্ব হয় রাফায়েল আলবার্তিরও সঙ্গে এবং এই দুটি মানুষের অমূল্য বন্ধুত্বই কবি নেরুদার রাজনৈতিক দীক্ষার মূলে। পরের বৎসর কবি প্রেরিত হন বারসিলোনাতে বাণিজ্যদূত হিসাবে এবং এই সূত্রেই কবি লোরকার সঙ্গে স্বকণ্ঠে নিজস্ব কবিতা পাঠ করেন মাদ্রিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্মৃতিচারণে এই দিনগুলির প্রাণ-প্রাচুর্যের কথা প্রকাশ পেয়েছে স্বতঃস্ফূর্ত বর্ণনায় ও নানা গল্পে। কিন্তু এই আনন্দের উপর যবনিকাপাত হয়েছে অল্পদিন পরেই। ১৯৩৬-এ কবি লোরকা অতর্কিত নিহত হন ফ্যাসিবাদী ঘাতকের হাতে। মহৎপ্রাণ কবিবন্ধুর নির্মম রাজনৈতিক হত্যা কবিকে সেদিন স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি করেছিল,—"আমি ভাবতেই পারিনি যে, পৃথিবীতে এমন রাক্ষসও আছে যে শিশুর মত সরল আনন্দোচ্ছল স্পেনের এই কবিকে হত্যা করতে পারে।" এই হত্যার নিষ্ঠুরতা কবির চিত্তকে শানিত করেছে "অন্ধকারের সঙ্গে আলোর যুদ্ধে" সৈনিকের ভূমিকায়। কবি নেমে এলেন মুক্তিযুদ্ধের মল্লভূমিতে তাঁর কবিতার হাতিয়ার নিয়ে। শ্রমিক ও কৃষকের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ

মিলিয়ে শুরু হল তাঁর যাত্রা—কর্মে ও কথায় অর্জন করলেন সেই মাটির কাছাকাছি মানুষগুলির 'সত্য আত্মীয়তা'। কবিতার প্রকরণে ও আঙ্গিকে এবার তিনি হয়ে উঠলেন গণজীবনের কবি—People's Poet। কবিতাগুলিতে কবিমনের স্বগতোক্তির পরিবর্তে এল ভাষণের রীতি—যার উদ্দেশ্য অগণিত শ্রোতা, যার লক্ষ্য গণ-জাগরণ। 'মর্তের আবাস'-এর কবি এবার তাঁর প্রকৃত পথ খুঁজে পেয়েছেন, যে পথে শোনা যায় সহস্রের পদধ্বনি। 'স্পেন আমার অন্তরে' কবিতাগুচ্ছের মধ্যে এই সুর স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। 'কয়েকটি ব্যাপার বুঝিয়ে বলছি' কবিতাটির কয়েকটি ছত্র এ যুগের প্রতিনিধি হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে :

স্পেনের প্রতিটি কোটর থেকে
জেগে উঠ্‌ছে স্পেন
আর প্রতিটি মৃত শিশু থেকে একটি করে রাইফেল
দুটি চোখ নিয়ে,
প্রতিটি অপরাধ থেকে জন্ম নিচ্ছে শতশত বুলেট
একদিন যার লক্ষ্য হবে তোদের হৃদয়ের কেন্দ্র।

স্পেনের গৃহযুদ্ধে মুক্তিসৈনিকের ভূমিকা গ্রহণ ও অগ্নিগর্ভ ভাষায় অত্যাচারের প্রতিবাদ ঘোষণার মূল্য দিলেন কবি হাসিমুখে তাঁর বাণিজ্যদূতের চাকরী হারিয়ে। ১৯৩৮ সালে শুরু হলো কবির অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ 'সাধারণের গান' রচনা। পঞ্চদশ অংশে বিভক্ত এই গ্রন্থটি চিলির গণজীবনের মহাকাব্যরূপে প্রকাশিত হয়েছিল বারো বছর পরে—১৯৫০-এ। অন্তবর্তীকালে তিনবছরের জন্যে তিনি মেক্সিকোতে বাণিজ্যদূতের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৫-এ চিলির শোরাথনি শ্রমিক অঞ্চল থেকে নির্বাচিত হন সেনেটার রূপে। এর অব্যবহিত পরে তিনি যোগদান করেন কমিউনিস্ট পার্টিতে সভ্য হিসাবে। ১৯৪৮-এ কমিউনিস্টদের সমর্থনেই ভিদেলো নির্বাচিত হন চিলির প্রেসিডেন্ট কিন্তু তাঁর দ্বারাই আবার অবিলম্বে প্রতারিত হলো চিলির মানুষ, প্রতিষ্ঠিত হলো একনায়কতন্ত্র। এর বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে সোচ্চার নেরুদাকে সরকারী অত্যাচারের আশঙ্কায় ছাড়তে হলো নিজের দেশ। শুরু হলো সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁর পথ-পরিক্রমা, আশ্রয় মিললো শ্রমিক ও কৃষকের ঘরে ঘরে। এই সময়টিকে কবি বর্ণনা করেছেন তাঁর 'কবি-জীবনের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনারূপে'। 'সাধারণের গান'-এর দশম অংশে 'পলাতক' কবিতাটি এই জীবনেরই চিত্র। একথা অনস্বীকার্য যে, এই সময়েই তাঁর কাব্যের প্রকৃতিতে সঞ্চারিত হয়েছে এক উচ্চ স্বরগ্রাম—এক সুস্পষ্ট বাক্‌ভঙ্গি, যা কাব্যমণ্ডিত ও হৃদয়স্পর্শী। 'পলাতক'-এর শেষ স্তবকটিকে দৃষ্টান্ত হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে :

সঙ্গীহীন নই আমি
অন্ধকার সমাচ্ছন্ন রাতে
আমি জনসাধারণ, অগণিত জনসাধারণ।
আমার কণ্ঠে আছে সাবলীল বলদৃপ্ত স্বর

লঙ্ঘন যা করে নৈঃশব্দকে
এবং তা অংকুরিত হয় অন্ধকারে।
বীজকে আচ্ছন্ন করে
মৃত্যু, দুঃখ, প্রেতদল, তুষার সহসা,
মনে হয় জনগণ আবৃত কবরে।
কিন্তু শস্য ফিরে আসে ধরার মাটিতে
তার লাল দুর্নিবার হাতগুলি নৈঃশব্দ বিদীর্ণ ক'রে জাগে
মৃত্যু যায়, নবজন্ম আসে।

'সাধারণের গান' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বেনামে এবং সেই গ্রন্থের পরপর অনেকগুলি সংস্করণই বের হয়েছিল অনুরূপভাবে। কবির কথায়—'অনেকেরই' তো পিতৃপরিচয় থাকেনা—যাদের জন্ম হয় প্রাকৃতিক প্রেমঘন কোনো মুহূর্তে, এ বইটিও তাই।" এই বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে কী গভীর ভালোবাসায় কবি বইটিকে অন্তরে লালন করেছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, "কবিতাগুলির মধ্যে বেশিরভাগই ছিল চিলির জন্য আমার মনোবেদনা, ম্যাটিলডের প্রতি আমার প্রেম এবং তদানীন্তন সমাজ আর অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক বিশ্লেষণ।" কবিতাগুলির সৌন্দর্য-বর্ণনাকে কেন্দ্র করে তদানীন্তনকালে কেউ কেউ মনে করেন যে, এর ফলে রাজনৈতিক-শিল্পীর আদর্শচ্যুতি ঘটেছে। এর উত্তরে কবি বলেছিলেন—"আমার দল তো সৌন্দর্য-বর্ণনার বিরোধী নয়!" একথা অনস্বীকার্য যে, এই গ্রন্থের কবিতাগুলির মধ্যে উদ্দীপনাময়ী বাক্‌ভঙ্গি, জ্বালাময়ী ভাষা, অত্যাচারীর প্রতি তীব্র বিষোদ্গার এবং চিরাচরিত ভব্যতার বাঁধন থেকে কবিতাকে মুক্ত করার এক প্রচেষ্টা ছিল, এবং এর ভাষা ছিল মার্জিত ও অলংকারাশ্রয়ী। কিন্তু এসব সত্ত্বেও কবিতাগুলির মধ্যে এক বিশাল দেশ ও বিস্তৃতকাল এমন এক প্রাণস্পন্দনে ধ্বনিত হয়েছে যার সাক্ষাৎ মেলে একমাত্র বৈপ্লবিক ও গঠনমূলক রোমাণ্টিকতায়। 'রোমাণ্টিক' শব্দটি হয়তো অনেকের মনঃপূত নাও হতে পারে, কেননা বহু ব্যবহারে এই শব্দটির অনেক ক্ষেত্রে অর্থোপকর্ষ ঘটেছে, কিন্তু অপর কোন অভিধা আমার জানা নেই যার দ্বারা ঐ কবিতাগুলির বিশেষ অভিব্যক্তিকে বোঝানো সম্ভব। একথা সত্য যে উনিশ শতকের শেষদিকে শিল্প-সাহিত্যে রোমাণ্টিক ভাবধারার অবক্ষয়ের যুগে এক ধরনের ব্যাধিগ্রস্থ 'আমি সত্তা' শিল্প-সাহিত্যের আবহাওয়াকে সমাজ তথা জীবনবিমুখ করে তুলেছিল। এক ধরনের মানসিক পক্ষাঘাতে ভুগছিলেন কিছু কবি-শিল্পী, যাঁরা 'art for arts' sake' নামক এক কল্পলোকের গজদন্তমিনারের গবাক্ষ পথে দেখেছিলেন মানুষ ও পৃথিবীকে। স্বভাবতই এ শতকের প্রথমদিকে এই আত্মকেন্দ্রিকতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন কবি-শিল্পীরা, তাঁরা চেয়েছিলেন 'আমি'র আবরণ থেকে কবিতাকে মুক্ত করতে এবং সমাজচেতনায় তার উত্তরণ ঘটাতে। কিন্তু প্রকৃত রোমাণ্টিকতার রং তো ধূসর নয়। তার প্রকৃতির মধ্যে আছে অন্ধকার থেকে আলোয়, মৃত্যু থেকে জীবনে ফিরে আসার স্বপ্ন, আছে "আমরা করব জয়" মন্ত্র।

অন্ধকার যুগের অবসানে রেনেসাঁতেই এর প্রথম উন্মেষ—ব্যক্তির ও বহির্বিশ্বের দ্বন্দ্ব সংঘাতজনিত ব্যক্তিচেতনার নির্বেদে নয়, ব্যক্তিত্বের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয় প্রতিষ্ঠায়—সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্র ও পারমার্থিক ছদ্মবেশের আড়ালে যাজক সম্প্রদায়ের অত্যাচারের বিরুদ্ধে, ব্যক্তিচেতনা অস্বীকারের বিরুদ্ধেই এই রোমান্টিকতা অভিব্যক্ত। অরলিন্সের কুমারীর স্বপ্ন সেই রোমান্টিকেরই স্বপ্ন। মুক্তি, মর্তপ্রীতি, ঐহিক জীবনের মূল্যবোধ—এই নিয়েই সেদিনের 'আমি সত্তা'টি অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছিল আলোর অভিসারে, সুন্দরের অভিসারে। বিশ্বপ্রকৃতি ও জীবন, এক ও অনেক—সেখানে অপূর্ব রূপে-রসে মিলে এক হয়ে গিয়েছে—ব্যক্তিচেতনা বিলীন হয়েছে বিশ্বচেতনায়। নেরুদা সেই চেতনারই কবি : 'মনে হয়েছে—মানুষ নামে একটি বিশাল মহীরুহের আমি যেন একটি পত্র।' যে-মানুষ স্বপ্ন দেখতে জানে না, তার কাছে পাহাড় শুধু পাথর, গাছ শুধু উদ্ভিদ আর মানুষ যুক্তিবুদ্ধিসম্পন্ন একটি জীবমাত্র। নেরুদার কবিতায় ও স্বপ্নে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, গাছপালা, ব্যক্তি-জনতা, অতীত ও ভবিষ্যৎ সবই মিলেমিশে একাকার হয়েছে এক সমগ্রতায়। পরিণত কবি যখন ইসলা নেগ্রায় প্রকৃতির রূপে-রসে আকণ্ঠ নিমজ্জিত সেই সময়ের কবিতা 'আমার প্রতীক্ষা কর হে পৃথিবী'। এর কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করছি :

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে আদিত্য,
আমার আদিম নিয়তিতে,
*　　*　　*　　*　　*
তৃণভূমি, পাহাড়ের শান্তি নিরালার,
আর্দ্রবায়ু তটিনীপ্রান্তের,
লার্চগাছে জড়ানো যে ঘ্রাণ,
প্রাণবন্ত হাওয়া যেন স্পন্দিত হৃদয়
সুমহান অরকেরিয়ায় কাঁপা জনতার ভিড়ে।

এখানে লক্ষ্য করতে বলি 'আদিম নিয়তি' ও 'জনতার ভিড়ে' কথাগুলি এবং তার সঙ্গে মধ্যবর্তী অংশের প্রকৃতির রূপরসবর্ণনের সমারোহটি। নেরুদা জনতার কবি, নেরুদা প্রকৃতির কবি—কিন্তু কেন ঐ 'আদিম নিয়তি'র কথাটা এসে গেল ? নেরুদার প্রকৃত মহত্বের মাপ ঐখানে—তার মন সঞ্চারিত মহাকালে ও মহাবিশ্বে, যার মূলে রয়েছে ক্ষিতি-অপ্-তেজ, মরুৎ ও ব্যোমের এক অখণ্ড চেতনা। আদিম নিয়তি সেই অর্থেই দ্যোতিত—অদৃষ্টবাদ নয়। ঠিক এই একই সুর ধ্বনিত হয় 'থেমে যায় নদী কলতান' কবিতাতে—সেখানেও ঐ 'নিয়তি' শব্দটি আছে এবং একইভাবে সেখানে তা অন্বিত তাঁর আশাবাদী সামগ্রিক চেতনায় :

এ তরণী যদি আর বন্দরে নাই ফেরে ক্লান্তিহীন দাঁড় টেনে
জলকল্লোল যদি আপন মনে মিশে যায় মন্দ্রিত সাগরে
তোমার সোনালী কটি যদি সুষমায় ভরে ওঠে আমার দু হাতে
তবে এসো, মেনে নিই নতশিরে সমুদ্রেই ফিরে যাওয়া—অব্যর্থ নিয়তি।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দের 'পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'গণমানুষ' কবিতাটির মর্মকথা গণজীবনের ধারাপথে ব্যক্তিজীবনের অব্যাহত প্রবাহ—সংগ্রামের পথে—মৃত্যুতে ও নবজন্মে এবং অবশেষে এক শোষণমুক্ত সমাজে তার পূর্ণ মানবিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা। কিন্তু :

পৃথক ক'রে কে তাকে চিনবে
যদি সে বিলীন হয়ে থাকে এক সমগ্রতায়
মৃত্তিকা, অঙ্গার, বা সমুদ্র, মানুষের বেশ ধরে ?

নেরুদা গণজীবনের কবি, কিন্তু-'গণকবি' এই কথাটি সচরাচর যে-অর্থে বিশিষ্ট জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিরাও ব্যবহার করে থাকেন, আমার মনে হয় সেই অর্থে নেরুদার মূল্যায়নে তাঁর বিশালতাকে সম্যক উপলব্ধি করা যায়না। সাধারণ মাপের কবিদের বিচারে 'সিম্বলিস্ট কিংবা পজিটিভিস্ট' ইত্যাদি যে বিশেষণগুলি নির্দ্বিধায় ব্যবহার করা যায়, বড় মাপের বা বিশ্বকবির ক্ষেত্রে সেগুলি দিয়ে সবটুকু ফাঁক ভরানো যায় না—আমাদের বুদ্ধি সেখানে স্তব্ধ, আমাদের শব্দ সেখানে অক্ষম। অন্তরঙ্গ বন্ধু ও কবি লোরকার মৃত্যুতে কাব্যে যে শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়েছিলেন নেরুদা, সেই বিখ্যাত কবিতাটির একটি পংক্তি: 'ওরা হাসপাতালকে শোভিত করছে আকাশী নীলে তোমারই জন্যে'। কোন এক জনসভায় জনৈক শ্রোতা কবিকে প্রশ্ন করেছিলেন, কেন তিনি 'নীল' রং ঐ কবিতায় ব্যবহার করেছেন। উত্তরে কবি বলেছিলেন, "কবিতা কোনো সময়েই স্থিতিশীল নয়, কবিতা জলস্রোতের মতো, মাঝে মাঝে সৃষ্টিকর্তার হাতের নাগাল থেকে বেরিয়ে এগিয়ে যায়। কবির রচনায় অবিমিশ্র বস্তুতে যে কোনো পদার্থ থাকতেও পারে, আবার নাও থাকতে পারে। আবার এমন বস্তুও হতে পারে যা আছে বা যা একেবারেই নেই।"

অন্যত্র কবি বলেছেন—"যে-কবি বাস্তবকে অস্বীকার করেন তিনি মৃত—আবার যে-কবি শুধুমাত্র বাস্তবকেই স্বীকার করেন তিনিও মৃত। এটা খুবই দুঃখের ব্যাপার যে, বিচার-বুদ্ধিহীন কবিকে একমাত্র তিনি নিজে আর তাঁর প্রেমিকা ছাড়া কেউ বুঝবে না। আবার প্রখর বিচারসম্পন্ন কবিদের একমাত্র গদর্ভ ছাড়া কেউ বুঝবে না।"

'প্রখর বিচারের' সম্পর্কে কবি কীটসের উক্তিটি মনে পড়ে : "Though the dull brain perplexes and retards"—কাজেই কবিদের কাছে পৌঁছতে গেলেও বুদ্ধির চেয়ে অন্তরের পথই প্রশস্ত।

শেষজীবন পর্যন্ত নেরুদা কবিতা লিখেছেন জীবনেরই জয়গানে—রাজনৈতিক কবিতা, ঐতিহাসিক কবিতা সমানেই লিখেছেন—মানবপ্রীতির মূল সুর বিস্তার লাভ করেছে—অন্তরায় সঞ্চারীতে। সারাজীবনের সংগ্রাম ও পথ-পরিক্রমার পর এবার একটু যেন বিশ্রামের জন্যে ব্যাকুল হয়েছেন ইসলা নেগ্রার শান্ত পরিবেশে—চিত্ত সমাহিত হয়েছে এক মন্ত্রমুগ্ধ তন্ময়তায়। 'উৎসবের শেষ' যেন দ্যোতনা করছে—এক ঘরে ফেরার সুর :

'এ আমির আবরণ' খসে পড়ে সে দীপ্ত আলোকে,

হাত দুটি স্বতোৎসারে নেমে আসে সমুদ্রের বুকে,
অস্পষ্ট সংশয়গুলি স্বচ্ছ হয়ে ওঠে ধীরে ধীরে,
শান্তির নিবিড় স্পর্শ পাই আমি মাটির গভীরে।

সেই একই 'অব্যর্থ নিয়তি' যা নেতিবাচক নয়, বিশুদ্ধ নন্দনতাত্ত্বিক বাস্তব-বিমুখতা নয়, এক সজীব উপলব্ধি। কিংবা 'থেমে যায় নদী কলগানে': 'সময় হয়েছে, প্রিয়, চুরমার করবার বিষণ্ণ গোলাপ।' এই 'বিষণ্ণ' শব্দটি নেরুদার একটি প্রিয় শব্দ—কিন্তু কিসের এই বিষণ্ণতা? 'বিষণ্ণ গোলাপ' কথাটি একটি অসামান্য প্রতীক বলে আমার মনে হয়েছে। রূপে-রসে, আশায়-ভালবাসায় গড়া জীবনের প্রতীক 'গোলাপ', তা বিষণ্ণ—কেননা তা জীবনের মতই ক্ষণভঙ্গুর, আর তা সুন্দর—কেননা তা ক্ষণভঙ্গুর। এ-বোধের জন্মও পার্থিব জীবনের মূল্যবোধে, রেনেসাঁয়—যে রেনেসাঁর অর্থ 'চরৈবেতি'। কবি নেরুদার কাব্যেও এই এগিয়ে চলার মন্ত্রধ্বনিই উচ্চারিত।

এবার অনুবাদ-প্রসঙ্গে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। সচেতন পাঠকেরা নিশ্চয় জানেন, পাবলো নেরুদার নির্বাচিত কিছু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন খ্যাত ও অখ্যাত কোন কোন কবি। সুতরাং আর একখানি অনুবাদ গ্রন্থ সংযোজনের সার্থকতা সম্পর্কে কিছু কৈফিয়ৎ দেওয়া আমার কর্তব্য বলে মনে করি। প্রথমত, যে-কোন ভাষায় নেরুদার মত বিশ্ববরেণ্য কবির কবিতাবলীর অনুবাদের সংখ্যা যত বাড়ে সেই ভাষা ও সাহিত্য ততই সমৃদ্ধ হয়। দ্বিতীয়ত, বেশি সংখ্যক অনুবাদ গ্রন্থের মাধ্যমে পাঠকের কাছে কবি নেরুদাকে পৌঁছে দিলে তাঁরা একজন মহৎ কবির সৃষ্টিকর্মের তুলনামূলক বিচারেও প্রবৃত্ত হতে পারেন। তৃতীয়ত, যাঁরা কবিতাপ্রেমী, কবিতা পড়তে ভালবাসেন, নতুন একটি অনুবাদ গ্রন্থে তাঁরা কিছু কিছু নতুন স্বাদ তো পেতেই পারেন। কারণ, কোনো একটি বিশেষ কবিতার সৌন্দর্য একজন অনুবাদকের কাছে যেমন করে প্রতিভাত হয়, অপর একজনের কাছে তার দ্যোতনা হয়তো ভিন্ন রূপ ধারণ করতে পারে। যা বিশাল ও মহৎ তার সৌন্দর্য এক-এক জন মানুষের কাছে এক-এক ভাবে অভিব্যক্ত, কেননা সৌন্দর্যের মূলে থাকে হৃদয়গত নানা টানাপোড়েন ও বৈচিত্র্য।

এছাড়া, যে অনুবাদগুলি আমি আজ অবধি দেখেছি তার কয়েকটিতে বেশ কিছু কাব্যিক অসংগতি, এমন কি ক্লেশকর ভ্রান্তিও আমার চোখে পড়েছে। বিদেশী ভাষার সীমিত জ্ঞান নিয়ে আমাদের অনুবাদ করতে হয়। তদুপরি, কবিতার অনুবাদ সত্যিই দুঃসাধ্য এবং শেষ পর্যন্ত নিঃসন্দেহে এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। যাঁরা কবিতা পড়েন তাঁদের নিশ্চয় জানা আছে যে, কবিতার শব্দগুলি কিভাবে ব্যাকরণের বেড়া ভেঙ্গে, অর্থের সীমা পেরিয়ে পদে পদে পাঠককে বিস্ময়ে হতবাক করতে থাকে, এখানে চুপ করে থেকেও কোনো কোনো সময় শুধু উপলব্ধিই করা যায়। কিন্তু অনুবাদককে তো চুপ করে থাকলে চলবে না—কথায় ধরে আনতে হবে ঐ স্কুল-পালানো বেপরোয়া শব্দগুলির রীতিবহির্ভূত

আচরণকে, যতদূর এবং যতখানি সম্ভব।

যাহোক, অনুবাদের উৎকর্ষ-অপকর্ষের বিচার করবেন পাঠকেরা। মূল ভাষা স্প্যানিশ আমার অধিগত নয়, আমাকে নির্ভর করতে হয়েছে নিছক কিছু ইংরাজী তর্জমার উপর। ভুলভ্রান্তি ঘটা তাই স্বাভাবিক। সহৃদয় পাঠকেরা সেগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করলে আমি সত্যিই খুশি হব।

আর একটি কথা বলা প্রয়োজন। অনুবাদ করতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে, নেরুদার কবিপ্রকৃতির স্বরূপ নির্ণয় করা ও বিশেষ বিশেষ কবিতার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সেই কবিপ্রকৃতিকে অনুধাবনের চেষ্টা করাও অনুবাদকের অন্যতম কর্তব্য। 'নেরুদার কবিকৃতি প্রসঙ্গে'র অবতারণা আমি সেই কারণেই করেছি। এছাড়া, নেরুদার অনেকগুলি কবিতার অনুবাদ, যা আগে কেউ করেছেন বলে জানি না, এই গ্রন্থে পাঠককে দিতে পেরেছি বলে কৃতার্থ বোধ করছি।

আমার এই দুঃসাহসিক প্রয়াসে ঋণের বোঝা অপরিমেয় ও অপরিশোধ্য। আমাকে প্রথম থেকে শুরু করে এই গ্রন্থ প্রকাশ করা পর্যন্ত সস্নেহ অভিভাবকত্বে যিনি পরিচালনা করেছেন তিনি প্রগতি-সাহিত্যের গবেষক 'মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক'-খ্যাত সোদরপ্রতিম কবি ধনঞ্জয় দাশ। তাঁর কাছে ঋণ স্বীকার করার মূঢ়তা আমার নেই। আমার বন্ধু শিল্পসমালোচক অধ্যাপক প্রভাতকুমার দত্ত তাঁর মূল্যবান সংগ্রহ থেকে নেরুদা-সংক্রান্ত কয়েকখানি দুষ্প্রাপ্য বই দিয়েও আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। সাহিত্যরসিক পরম শুভার্থী অধ্যক্ষ ডঃ দীনবন্ধু চট্টোপাধ্যায়, সংগীতরসিক বন্ধু অধ্যাপক শিশির সেন ও আমার স্নেহাস্পদ অধ্যাপিকা সুতপা নিয়োগী—এঁরাও আমাকে নানাভাবে সহায়তা করেছেন। নেরুদার Memoirs-এর অনুবাদক ডাঃ ভবানীপ্রসাদ দত্তের 'অনুস্মৃতি' থেকেও আমি কিছু কিছু সাহায্য পেয়েছি, সকৃতজ্ঞ-চিত্তে তাওস্বীকার করছি। কৃতজ্ঞতা জানাই 'সাহিত্য সমবায়'-এর বন্ধুদের ; বলা যায় তাঁদেরই ঔদার্য ও সযত্ন প্রয়াসে এই বইখানি প্রকাশিত হচ্ছে। এছাড়া প্রাইমা পাবলিকেশনস-এর কর্ণধার নারায়ণ সেনগুপ্ত এই গ্রন্থের পরিবেষণার দায়িত্ব গ্রহণ করায় তাঁর কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। অনূদিত কবিতাগুলি পাঠকমনকে তৃপ্তি দিলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করব।

অশোক রাহা

## কবিতা

হ্যাঁ, ঠিক সেই বয়সে····· এসেছিল কবিতা
আমাকে খুঁজতে। আমি জানিনা আমি জানিনা
কোথা থেকে, শীত কিংবা কোনো নদী থেকে
আমি জানিনা কেমন করে বা কখন সে এসেছিল—
না, ওরা স্বর নয়, শব্দ নয়,
নয় নৈঃশব্দও,
তবে এক পথের থেকে এসেছিল আমার পরোয়ানা
এসেছিল রাতের শাখা-প্রশাখা থেকে
খামৃকা অন্যদের মাঝ থেকে,
দাউ দাউ যেখানে আগুন
কিংবা একা একা ফেরার সময়
সম্পূর্ণ জনমানবহীন একা
তখনই পেয়েছি তার স্পর্শ।

আমি কথা খুঁজে পাইনি বলার, দিশাহারা
আমার মুখে কিছুতেই আসেনি
কোন নাম,
আমার চোখ দু'টি ছিল অন্ধ
কিন্তু কি যেন জেগেছিল বুকে—
ব্যাকুলতা কিংবা বিস্মৃত দুটি ডানা।
আমি চিনে নিলাম আমার পথ,
সেই আগুনের রহস্য খুঁজে খুঁজে
আমি লিখলাম অস্পষ্ট প্রথম পংক্তি
ভীরু, বস্তুভারহীন, নিছকই
নির্বোধ,
কিন্তু যে কিছুই জানেনা
তার কাছে অনাবিল প্রজ্ঞা,
উদ্ভাসিত হল সহসা আমার চোখে
স্বর্গলোক
উন্মুক্ত
উদার,

গ্রহপুঞ্জ,
স্পন্দিত যত শস্যক্ষেত্র,
শতছিদ্র ছায়া,
জর্জরিত
        শরে শরে,
ফুলভার ও বহ্নি,
কুণ্ডলিত রাত্রি, মহাবিশ্ব।
আমি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণ,
মদবিহ্বল নক্ষত্রখচিত
সুমহান সে শূন্যের সাথে,
তারই প্রতিরূপ,
সে রহস্যের
উপলব্ধি করলাম আপনাকে এক অবিকৃত অংশ
অন্তহীন সে অতলের,
সাথী হলাম নক্ষত্রের আবর্তনে,
হাওয়ার বুকে ছড়িয়ে গেল চূর্ণবিচূর্ণ আমার হৃদয়।

# শব্দ

শব্দ
জন্মেছিল রক্তের ভিতরে,
দেহের নিগূঢ়লোকে
বেড়েছিল, স্পন্দনে স্পন্দনে,
ওষ্ঠ ও মুখের পথে ব'য়েছিল অবাধ প্রবাহে।

দূরে বহুদূরে আর নিকটের আরো সন্নিকটে
এসেছিল ক্রমাগত,
মৃত পিতৃপুরুষের পথে,
আর যত যাযাবর হতে,
সেই সব দেশ থেকে পাথরে গিয়েছে যারা ফিরে,
পথশ্রান্ত অতি দীন দলগুলি নিয়ে,
কেননা চলার পথে দুঃখ-শোক এলে
পুরানো আবাস ছেড়ে যাত্রা করেছিল,
অবশেষে পৌঁছে গিয়েছিল
সেখানে নূতন দেশও
পুনরায় নদীজলে মিলে
বুনেছিল নবতর শব্দের ফসল।
অতএব, এরই নাম উত্তরাধিকার—
ব্যবধান দুই তরঙ্গের
আমাদের যুক্ত করে দেয়
একদিকে গতপ্রাণ মানুষের সাথে
অন্যদিকে, অনাগত জীবনের অস্পষ্ট প্রত্যুষে
অজ্ঞাত যা আজও।

তবুও আকাশ কাঁপে
প্রারম্ভিক শব্দের দোলাতে
অঙ্গে তার পরিহিত
সন্ত্রাসের সাথে দীর্ঘশ্বাস
নির্গত হয়েছে শব্দ

অন্ধকার থেকে
আজও কোন বজ্র নেই
শব্দের মতন দৃঢ়
শোনা যায় যার মন্ত্রধ্বনি,
উচ্চারিত হয়েছিল
যে শব্দ প্রথম—
হয়তো তা শুধু মাত্র একটি বুদ্বুদ, মাত্র বিন্দু এক,
তবুও নিয়ত তার প্রবল নির্ঝর
ভেঙ্গে পড়ে, শব্দে ভেঙ্গে পড়ে।

কালক্রমে ধীরে, শব্দ পূর্ণ হয়ে ওঠে অর্থের সম্ভারে।
গর্ভে তার সুপ্ত সম্ভাবনা, এবং তা ভরে ওঠে সংখ্যাতীত প্রাণে।
নবাগতদের নিয়ে কত তৎপরতা, আর ধ্বনিগুলি--
হাঁ-সূচক প্রাঞ্জলতা, দার্ঢ্যগুণ,
অস্বীকার, ধ্বংস, মৃত্যু—
ক্রিয়াপদ সর্বশক্তি অধিগত ক'রে
সৌন্দর্যের বিপুল উদ্ভাসে
সমন্বয় করেছিল অস্তিত্বে নির্যাসে।

মানুষের শব্দ, শব্দধ্বনি,
আলোক বিস্তার আর
রৌপ্যকার কৃত শিল্প যেন সমন্বয়,
উত্তরাধিকারে প্রাপ্ত পানপাত্র, নিবদ্ধ যেখানে
রক্তের সংযোগ—
নৈঃশব্দ জমেছে ধীরে এরই মাঝে
পূর্ণতায় মানবভাষার।
আর মানুষের কাছে, স্তব্ধবাক যে সে মৃত—
ভাষার বিস্তার গেছে কেশেরও ভিতর
ঠোঁট দুটি যদি থাকে নিষ্ক্রিয় তথাপি
মুখ কথা বলে—
চোখ দুটি অকস্মাৎ কথা হয়ে ওঠে।

শব্দের নিকটে গিয়ে দেখি লক্ষ্য করে
মনে হয় শব্দ যেন নরদেহ, আর কিছু নয়,
তার সুবিন্যাস দেখি বিমুগ্ধ বিস্ময়ে
উচ্চারিত শব্দ মাত্রে খুঁজে পাই ভিন্ন ভিন্ন রূপ

উচ্চারণ করি আমি, তাই বেঁচে আছি
উচ্চারণ ব্যতিরেকে চলে যাই শব্দের সীমায়—
শব্দহীন দেশে।

আমি পান করি শব্দ, শব্দ তুলে ধরি,
ঠিক যেন উজ্জ্বল পেয়ালা,
পান করি সেই পাত্রে সুপবিত্র ভাষার মদিরা
কিংবা বারি অফুরন্ত,
শব্দের মাতৃক উৎস,
পানপাত্র, জল আর সুরা
জন্ম দেয় আমার সংগীত
উৎসমুখ ক্রিয়াই যেহেতু
পরিপূর্ণ প্রাণ—এ যেন শোণিত,
যে শোণিত মর্মকেই করে উন্মোচন
এ যেন ইশারা তার পাকে পাকে বাঁধন খোলার,
শব্দ কাঁচকে দেয় কাঁচের স্বচ্ছতা, শোণিতে শোণিত,
জীবনকে প্রাণ।

## গণমানুষ

আমার ভালই মনে আছে লোকটাকে,
আর তাকে প্রথম দেখেছি
না হলেও দু'শো বছর আগে ;
না, সে ঘোড়ায় চেপে আসেনি, গাড়িতেও নয়—
একদম পায়ে হেঁটেই
সে পেরিয়েছিল
দূরত্বের সবটাই,
তরোয়াল নিয়ে নয়, অস্ত্রও নয়
তবে কাঁধে সে জাল বইতো ঠিকই,
নয়তো কুড়ুল, হাতুড়ি বা কোদাল ;
মানুষ জাতটার সাথে তার দ্বন্দ্ব ছিলনা আদৌ—
তার লড়াই যতো জলের সাথে, নয়তো মাটির
নয়তো গমের, কেননা গম থেকেই তো রুটি,
মস্ত মস্ত গাছের সাথে, তারাই তো দেয় কাঠ
যাবতীয় পাঁচিলের সাথে, পাঁচিল ফুটিয়েই তো কবাট
বালিরও সাথে, ঘরের দেয়াল তো চাই
আর দরিয়ার জল, ফল তো ফলায় সেই।

হ্যাঁ, আমি চিনতাম তাকে, আর আজও সে বর্তমান আমার মধ্যেই।

ভেঙ্গে গিয়েছে, টুকরো টুকরো, সেই গাড়িগুলো
যুদ্ধ দিয়েছে গুঁড়িয়ে, যত প্রবেশদ্বার আর প্রাচীর
নগরের পরিণতি—একমুঠো ছাই ;
রাশি রাশি পরিচ্ছদ ম্লান হয়েছে ধূলোয়
শুধু টি'কে আছে সেই, আছে আমারই জন্যে
মরুবালুতে ঠায়
যেখানে একদিন মনে হয়েছিল সবই অটুট, শুধু সেই নয়।

কালের পথ বেয়ে আসছে কত ঘর-সংসার,
মিলিয়ে যাচ্ছে কতই,
কখনো সে এসেছিল আমার পিতা রূপে

কখনো বা পরিজন
অথবা ( এ হতে পারে, আবার না-ও পারে )
হয়তো সেই মানুষটিই সে, যে ঘরে ফেরেনি আর
কেননা তাকে গ্রাস করেছে
হয়তো অপ্ নতুবা ক্ষিতি,
অথবা তার মৃত্যু ঘটেছে কোন যন্ত্রের ঘায়ে বা গাছ প'ড়ে
অথবা সেই সে শবানুগমনের সূত্রধর
যে হাঁটতো কফিনের পিছু পিছু, এক ফোঁটা জলও নেই চোখে
এমনই একজন যার নিজের কোন নাম ছিলনা কদাপি
যেমন থাকে কাঠের বা ধাতুর তাই ছাড়া,
যাকে অন্যেরা দেখত উঁচুতলা থেকে
যাতে চোখে পড়ত পিঁপড়ের ঢিবিটাই
পিঁপড়ে রয়ে যেত চোখের অগোচরে—
ফলে দীনতায় আর ক্লান্তিতে
তার পা দুখানা আর চলতে পারেনি
সে মরে গিয়েছিল,
ওরা দেখতে পায়নি
অভ্যস্ত নয় বলেই
আর এর মধ্যেই আর এক জোড়া পা
পথে নেমেছিল তারই স্থানটিতে।

কিন্তু ঐ পা দুখানি তার-ই
ঠিক তেমনি অপর দু'টি হাতও
রয়েই তো গিয়েছিল মানুষটা
যদিও মনে হয়েছিল নিঃশেষিত ;
সে এল, একই মানুষ, এবারও আবার
ফিরে এল সে ই, করল জমিতে চাষ
হল দরজি, কিন্তু জামা নেই অঙ্গে
সে ছিল ঠিকই, ছিল না-ও বটে, আগের মতই,
সে চলে গিয়েছিল, আবার ফিরেও এসেছিল
আর যেহেতু তার কখনো গোরস্থান জোটেনি
অথবা কবর, কিংবা তার নাম খোদাই হয়নি
পাথরের ফলকে
যে পাথর সে নিজেই কেটেছে ঘাম ঝরিয়ে।
কেউই জানতো না তার আসার খবর
কেউ রাখেনি তার মরার খবরও

কাজেই হতভাগা লোকটা যখনই পেরেছে
বেঁচে উঠেছে নিজেই, দৃষ্টির অগোচরে, আবারও।

হ্যাঁ—সেই লোকটিই বটে, উত্তরাধিকার ছাড়াই,
গবাদিপশু, আভিজাত্যের তকমা—এর কোনটিই নয়,
এবং অন্যদের থেকে সে আলাদা ছিলনা একেবারেই
আসলে সেই অন্যেরা সে নিজেই
উপরতলা থেকে তাকে লাগতো
কাদামাটির মতই পাঁশুটে
চামড়ার মতই নীরস
পাকা গম হলুদ রং-এর
খনির গভীরে কালো রং-এর
দুর্গের ভিতরে পাথর রং-এর
জেলের ডিঙিতে টানির রং-এর
তৃণভূমিতে অশ্ব-রং-এর
পৃথক করে কে তাকে চিনবে
যদি সে বিলীন হয়ে থাকে এক সমগ্রতায়
মৃত্তিকা, অঙ্গার বা সমুদ্র, মানুষের বেশ ধ'রে ?

তার বসতি ঘিরে, মানুষের মুঠোয়
ধূলো হয়েছে সোনা
প্রতিকূল যতো পাথর,
কেটেছে সেই
তারই হাতে,
একে একে জেগে উঠেছে
রূপ নিয়ে, আকৃতি নিয়ে,
হর্ম্যসমূহ সুস্পষ্ট।

সে গড়েছে রুটি তারই হাতে
চলার গতি দিয়েছে রেলগাড়িকে
দূরদূরান্তে গ'ড়ে উঠেছে শহরাঞ্চল
গ'ড়ে উঠেছে সমৃদ্ধ কত জাতি,
হাজির হয়েছে মৌমাছিরা,
মানুষের সৃজন আর বংশবিস্তারে,
বসন্ত এসেছে ঝিঁকিঝিঁনির হাটে
পারাবতে আর রুটির কারবারে।

বিস্মৃতির গভীরে তলিয়ে গিয়েছিল সেই রুটির জনক,
যে হেঁটেছিল সড়ক বানিয়ে, বালি সরিয়ে
পথের দিশা দেখিয়ে দিগ্বিদিকে,
অপর সবকিছু যখন বিদ্যমান, সেই গিয়েছিল হারিয়ে
সে দান করেছিল তার অস্তিত্ব, সেটাই সারকথা।
অপর কোনখানে গিয়েছিল সে কাজ করতে, আর অবশেষে
মৃত্যুর গভীরে, যে মৃত্যু তাকে নুড়ির মতন
নিয়ে গিয়েছিল গড়াতে গড়াতে
স্রোতের অভিমুখে।

আমি তাকে তো চিনতাম, তাকে দেখেছি ডুবতে
তবু বেঁচে রইল সে তার ফেলে যাওয়ার মধ্যে—
সেই পথগুলি যেগুলি সে গ'ড়েছে কিন্তু ভাবেনি,
সেই গৃহগুলি, অনন্তকালেও সে যেখানে বাঁধবেনা ঘর।

আমি ফিরে এলাম তাকে দেখব বলে, আমি তারই পথ চেয়ে আছি প্রতিদিন।

আমি তাকে দেখতে পাই তার শবাধারে, দেখি পুনরুজ্জীবিত ।

আমি তাকে চিনে নিয়েছি অন্য সবার থেকে
যারা তার সমকক্ষ তাদের থেকে
আর আমার মনে হয়, এ হতে পারেনা
ঠিক এই পথ ধ'রে, আমরা চলছি না-ঠিকানাতেই
কোন গৌরবই নেই এ হেন এই টিকে থাকার।
আমি বিশ্বাস করি ঈশ্বর তাকে মানুষের বেশভূষাতে
প্রতিষ্ঠা করবেন যথার্থ মানবিক মর্যাদায়
আমার বিশ্বাস যারা নির্মাণ করেছে এই এতোসব
তাদেরই প্রাপ্য এর প্রতিটির কর্তৃত্ব,
আর রুটি যারা বানায় রুটি প্রাপ্য তাদেরই !

আর খনির নীচে যারা তাদেরই প্রাপ্য আলো !

এ যাবৎ অনেক হয়েছে শিকলপরা ধূসর মুখগুলোর !

অনেক হয়েছে ফ্যাকাশে হয়ে হারানো মানুষগুলোর !

আর একটি মানুষও যেতে পাবেনা প্রভুত্ববিহীন।

একটি নারীও মুকুটবিহীন।

সোনার দস্তানা উঠবে প্রতিটি মানুষের হাতে।

সূর্যের যত সম্ভার তাদেরই, যারা নাম গোত্রহীন!

সেই মানুষটিকে আমি চিনতাম, আর যখনই পেরেছি
যতক্ষণ তার চোখ দুটিতে ছিল দৃষ্টিশক্তি
কণ্ঠে যতক্ষণ ছিল স্বরটুকু
তাকে খুঁজেছি কবরগুলো যেখানে, আর তাকে বলেছি
তার দুটি হাত চেপে ধ'রে যা তখনও মিলায়নি ধূলায়ঃ

'সব কিছু চলে যাবে, তবুও বেঁচে থাকবে তুমি।

তুমিই প্রজ্জ্বলিত করেছ জীবন

তুমি যা' গড়েছ সে তোমারই।'

অতএব কেউ যেন কখনো ভাবনায় উদ্বিগ্ন না হয়
যখন মনে হয় আমি একা, একা নই আমি,
আমি আছি সবারই সাথে, আমার কথাগুলি সবারই কথা—

কেউ না কেউ শুনছে আমি যা বলছি, আর যদিও তারা জানেনা তা
যাদের গান আমি গাইছি, যারা জেগে উঠছে
তারা জন্মেই চলেছে প্রতিদিন, আর তারাই পূর্ণ করবে পৃথিবী।

## নাম, নাম আর নাম

সোমবারগুলো জড়িয়ে যায় মঙ্গলের সাথে
সপ্তাহগুলো গোটা বছরের সাথে।
তোমার ঐ ভোঁতামারা কাঁচিটা চালিয়ে
কাটা যায়না কাল বস্তুটিকে,
আর যাবৎ বারগুলোই তো
ধুয়ে মুছে যায় অন্ধকারের কালস্রোতে।

কেউই দাবী করতে পারেনা পেড্রো নামটা তারই
কেউই রোজা নয়, নয় মারিয়াও
আমরা সবাই ধুলো অথবা বালি
আমরা সবাই বৃষ্টির নীচে বৃষ্টি।

ওরা আমাকে বলেছে কত ভেনিজুয়েলার কথা
কত চিলির কথা, কত প্যারাগুয়ের
ওরা কি বলে আমার ছাই মাথায় আসেনা
আমি চিনি শুধু পৃথিবীর ত্বকটাকেই
আর জানি তার নাম নেই।

আমি যখন ছিলাম শিকড়বাকড়ের সাথে
ফুলে যে আনন্দ পেয়েছি তারও বেশি খুশি করেছে ওরা
আর যখন পাথরকে কিছু বলেছি
সে বেজে উঠেছে ঘণ্টার মত।

বড় দীর্ঘ পথ সময়ের, বসন্ত
গড়িয়ে চলে গোটা শীত জুড়ে।
সময়টা হারিয়ে ফেলেছে ওর জুতোজোড়া,
একটা বছরের মেয়াদ চার চারটে শতাব্দী।

আচ্ছা, রোজ রাতে আমি যখন ঘুমোই
কোন মাথামুণ্ডু থাকে আমার নামের ?
আর জেগে উঠলে, কেইবা অহং
আমার আমিত্বটাই যদি 'আমি' না থাকে নিদ্রায় ?

এ কথার অর্থ হ'ল এই যে—
প্রাণের উন্মেষ হতে না হতেই
আমরা হাজির হই ঠিক যেন নবজাত ;
কাজেই আদৌ ঠিক নয়
আমরা দ্বিধাগ্রস্ত নামে গালভরি,
একগাদা গুরুগম্ভীর সৌজন্য নিয়ে,
একরাশ জাঁকালো অক্ষর নিয়ে,
অতখানিটা তোমার আর আমার নিয়ে,
দস্তখত করি জাঁক করে কাগজপত্রে।

আমার একটা ঝোঁক আছে তালগোল পাকানোর,
তাদের যুক্ত করে নবজাত দেখতে,
তাদের গুলিয়ে দিয়ে নিরাবরণ করতে,
যতক্ষণ না সারাবিশ্বের আলো
মিশে যায় মহাসাগরের এককণ্ঠে,
এক উদার, বিশাল সমগ্রতা
স্ফুটরত সতেজ সৌরভ।

# পাহাড়ের মাঝে প্রতিকৃতি

আরে তাইতো! আমি ওকে চিনতাম, কতোকাল কাটিয়েছি ওর সাথে
ওর ঐ সোনালী দেহটার সাথে
বড় ক্লান্ত একটা মানুষ ছিল ও
প্যারাগুয়েতে ফেলে এসেছিল ওর বাবা আর মাকে
ওর ছেলেদের, ভাইপোদের,
পরিবারের আত্মীয় কুটুমদের,
ওর ঘরবাড়ি, মায় মোরগছানাগুলো,
আর গুটিকয় আধখোলা বই।

ওরা ওকে ডেকেছিল দোরগোড়ায়।
দরজা খুলতেই, ওকে ধরেছিল পুলিশ,
আর তারা এমন অমানুষিক পিটিয়েছিল ওকে
যে ও রক্তবমি করেছিল ফ্রান্সে, ডেনমার্কে,
স্পেনে, ইতালিতে—ঘুরতে ঘুরতে,
আর মারা গিয়েছিল অতঃপর
সেই ওকে আমার শেষ দেখা,
তারপর আর শুনতে পাইনি ওর প্রগাঢ় মিতভাষ।

পরে একদিন, এক ঝড়ের রাতে
যখন তুষার পড়ছিল ছড়িয়ে
মোলায়েম ঢিলে পোশাকের মত
পাহাড়গুলোর গায়ে,
ঘোড়ার পিঠে, দূরে, ঐ ওখানে
আমি চেয়ে দেখলাম
আর চোখে পড়ল আমার বন্ধুকে—
পাথর দিয়ে গড়া তার মুখখানা,
তার প্রতিকৃতি মুখ ফিরিয়ে তাচ্ছিল্য করছে দুরন্ত ঝড়কে,
তার নাসারন্ধ্রে গুমরে উঠছে বাতাসের চাপা শব্দ
নির্যাতিতের গোঙানীর মত।
দেশে ফিরে এসেছে নির্বাসিত।
পাথরের রূপান্তরে, বাস করছে তার আপন দেশেই।

# কয়েকটি ব্যাপার বুঝিয়ে বলছি

তোমরা জানতে চাইছ : কোথায় গেল লাইল্যাকগুলো ?
আর পপি-পাপড়ির মত অধিবিদ্যা ?
বারবার ছড়িয়ে পড়া বর্ষাধারার শব্দগুলো
যা' ফাটল চুঁইয়ে ঢুকে প'ড়ে রন্ধ্রগুলি ভ'রে তোলে
আর পাখিগুলো, তারাই বা কোথায় ?

আমি তোমাদের বলব সব কথাই।

আমার বসতি ছিল এক শহরতলীতে,
মাদ্রিদের এক শহরতলী, যেখানে ঘণ্টা বাজতো
ঘড়ি ছিল, আবার গাছও।

সেখান থেকে দূরে তাকালে দেখতে পেতে
কাস্তিলের খটখটে মুখ
যেন চামড়ার এক মহাসমুদ্র।

আমার বাড়িকে লোকে বলত
ফুলের বাড়ি, যেহেতু তার প্রতিটি ছিদ্রপথে
রাশি রাশি ফুটত জেরেনিয়াম : সে এক
সুরম্য নিকেতন
তার কুকুরগুলো আর শিশুদের নিয়ে।
তোমার মনে পড়ে, রাউল ?
র‍্যাফায়েল, তুমি কি বল ?
ফ্রেদেরিকো, কবরের তলা থেকে
তোমার কি মনে পড়ে আমার বারান্দা ছাপিয়ে
জুনের আলো ফুলের মতই ঝরে প'ড়ত তোমার মুখে ?
ভাই, আমার ভাইরে !
যা কিছু তার সবই ছিল
হাঁকেডাকে জমজমাট, বাছাই করা পণ্যসম্ভার,
গাদা গাদা হাতে গরম রুটি,
মূর্তি বসানো আরগুয়েল্লিস আমার সেই

শহরতলীর স্টলগুলো
হেক মাছের বেচাকেনার ঘূর্ণি লেগে
মনে হত নিঃশেষিত দোয়াতদান :
বৈঠার ভিতর গড়িয়ে আসত তেল,
বহু মানুষের আনাগোনায় উপচে প'ড়ত পথগুলো,
অপরিমেয় মিটার ওলিটারে
যেন অফুরন্ত জীবনেরই পরিমাপ,
গাদা করা মাছ
যেন ছাদের কড়িবরগার বুনটের মত,
সূর্য যেখানে মিটমিট করত,
হাওয়া-নিশান হ'ত দিশাহারা,
অপরূপ, গজদন্তের মত আলুর রাশি,
ঢেউ-এর পর ঢেউ এর মত টোমাটোগুলো
ক্ষ্যাপার মত আছড়ে প'ড়ত সাগরে।

অতঃপর এক সকালে আগুনে জ্বলে উঠল সব কিছুই
আগুন তার জিভ বাড়ালো মাটি থেকে আকাশে
এক সকালের বহ্ন্যুৎসবে
গ্রাস করল মানুষগুলোকে—
আর সেদিন থেকে দাউ দাউ জ্বলছে আগুন,
সেদিন থেকে বারুদ আর বারুদ,
সেদিন থেকে রক্ত আর রক্ত।
দস্যুরা এল প্লেন আর মুরদের নিয়ে,
দস্যুরা এল অঙ্গুরীয় আর ডাচেস্‌দের নিয়ে,
দস্যুরা এল কালো পোশাকী সন্ন্যাসীদের নিয়ে
আশীর্বাণী ছড়াতে ছড়াতে
আকাশ-পথে এল শিশুহত্যা করতে
আর রাস্তায় রাস্তায় শিশুদের রক্ত ছুটল ফিন্‌কি দিয়ে
উত্তেজনাবিহীন নিঃশব্দে,
যেমনটি হয় শিশুদের রক্ত।

শৃগালও অবজ্ঞা করে যে শৃগালকে,
নীরস কাঁটাগাছও যে পাথরকে কামড়ে ছুঁড়ে দেয় থু থু ক'রে,
যে কালসাপকে কালসাপও পরিহার করে ঘৃণায়।

তোমাদের সাথে মুখোমুখি আমিও দেখেছি

স্পেনের রক্ত উত্তুঙ্গ জোয়ারের মত
দম্ভ ও অস্ত্রশক্তির একটি মাত্র তরঙ্গে
তোমাদের তলিয়ে দিল অতলে !

বিশ্বাসঘাতক
সেনাধ্যক্ষের দল :
চেয়ে দ্যাখ্ আমার নিষ্প্রাণ বাড়িটার দিকে :
চেয়ে দ্যাখ্ গুঁড়িয়ে যাওয়া স্পেনের দিকে :
প্রতিটি গৃহ থেকে নামছে গনগনে ধাতুপ্রবাহ
যেখানে নামতো ফুলের জোয়ার,
স্পেনের প্রতিটি কোটর থেকে
জেগেউঠছে স্পেন
আর প্রতিটি মৃত শিশু থেকে একটি ক'রে রাইফেল, দু'টি চোখ নিয়ে
আর প্রতিটি অপরাধ থেকে শতশত বুলেট
একদিন যার লক্ষ্য হবে
তোদের হৃদয়ের কেন্দ্র।

আরও তোমরা জানতে চাইবে : ওর কবিতা কেন বলে না
স্বপ্নের কথা কিংবা সবুজ পাতার কথা,
ওর নিজের দেশের বড় বড় আগ্নেয়গিরির কথা ?

এসো, দেখে যাও কত রক্ত ঝরেছে পথে পথে।
এসো, দেখে যাও
কত রক্ত ঝরেছে পথে পথে,
এসো, দেখে যাও কত রক্ত
ঝরেছে পথে পথে।

# আর কতোকাল

মানুষ কদ্দিন বাঁচে, মোটের ওপর ?

এক হাজার দিন, না একটি মাত্র ?

এক হপ্তা, না কয়েক শতক ?

একজন মরে গিয়েই বা কাটায় কতোকাল ?

'চিরকাল' কথাটার অর্থই বা কি ?

এই সব ভাবনায় আর সব ভুলে
বেরুলাম ব্যাপারগুলোর ফয়সালা করতে।

খুঁজে বের করলাম ওয়াকিবহাল পুরুতদের,
তাদের জন্যে অপেক্ষায় রইলাম
তাদের আচারানুষ্ঠান না মেটা পর্যন্ত,
তাদের খুঁটিয়ে দেখলাম যখন তারা যাচ্ছিল
ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আশায় এবং শয়তানেরও।

আমার প্রশ্ন তাদের ক্লান্তিকর ঠেকেছিল,
আসলে তাদের নিজেদের ভাঁড়েই তেমন কিছু ছিলনা
তারা শাসকদের চেয়ে বেশি কিছুই নয়।

চিকিৎসকেরা আমি গেলে স্বাগত জানালো
তাদের পরামর্শ চলাকালীন ফাঁকে ফাঁকে,
প্রত্যেকের হাতেই অস্ত্রোপচারের খুদে খুদে ছুরি,
অরিওমাইসিনে ভিজে চপচপ,
ওদের ব্যস্ততা বেড়েই চলে প্রতিদিন।
ওদের কথাবার্তা থেকে আমি যদ্দুর ঠাওর করতে পারি,
তাতে সমস্যা দাঁড়াচ্ছিল নিম্নরূপ ঃ
ব্যাপারটা আসলে একটা জীবাণুর মৃত্যু নয় ততটা—

কেননা জীবাণুরা মরে টন-টন পরিমাণ—
কিন্তু যৎসামান্য যা টিঁকে যায়
তাদের মধ্যে প্রকট হয়ে ওঠে বিকৃতির চিহ্ন।
ওরা আমাকে এমনি ঘাবড়ে দিল যে
আমি খুঁজে বের করলাম কবর-খুঁড়িয়েদের,
গেলাম নদীর ধারে যেখানে তারা পোড়ায়
গাদা গাদা সাজানো গোছানো লাশ
ছোটখাট হাড্ডিসার দেহগুলো,
মারাত্মক অভিশাপের বাস ছড়ানো
রাজ রাজড়ার,
কলেরার তোড়ে এক ধাক্কায়
অক্কা পাওয়া মেয়েছেলেদের।
গোটা নদীর পাড় জুড়ে শুধু মড়া আর মড়া
আর ছাইমাখা সৎকার বিশেষজ্ঞরা।

যখন একটু মওকা পেলাম
এ প্রশ্নে ও প্রশ্নে তাদের করলাম নাজেহাল।
ওরা আমাকে প্রস্তাব দিল পোড়ানোর,
ঐ একটি বস্তুই ওরা জানে।

আমার নিজের মুলুকের অন্ত্যেষ্টি পেশার মুরুব্বিরা
মদ গিলতে গিলতে আমাকে জবাব দিল :
'দেখেশুনে একটা মেয়েমানুষের সঙ্গ করো
আর এই বোকামিটা ছাড়ো।'

মানুষকে এত খোশমেজাজে আমি আর কক্‌খোনো দেখিনি।

হাতের গেলাস তুলে ধ'রে ওরা গান ধরেছিল
মানুষের স্বাস্থ্য কামনায় এবং মৃত্যু কামনায়ও।
ওর সবকটাই ধাড়ী লম্পট।

ফিরে এলাম স্বগৃহে, অনেকগুলো চুলই পেকেছে
দুনিয়াটা ঘুরে।

এখন আর কারো কাছে কিছু জানতে চাইনা।

তবে রোজই মনে হয় কত কমই না জানি।

# আমার প্রতীক্ষা কর, হে পৃথিবী

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে আদিত্য,
আমার আদিম নিয়তিতে,
সুপ্রাচীন অরণ্যের বারিধারা তুমি,
আমাকে ফিরিয়ে দাও সেই ঘ্রাণ ও তরবারিগুলি
যা পড়ে আকাশ থেকে ঝ'রে,
তৃণভূমি, পাহাড়ের শান্তি নিরালার,
আর্দ্রবায়ু তটিনী প্রান্তের,
লার্চ গাছে জড়ানো যে ঘ্রাণ,
প্রাণবন্ত হাওয়া যেন স্পন্দিত হৃদয়
অরকেরিয়ার কাঁপা জনতার ভিড়ে।

আমাকে ফিরিয়ে দাও, হে পৃথিবী,
তোমার পবিত্র দানগুলি,
নৈঃশব্দের মিনার হয়ে যারা উঠেছিল
সে দানের মূল থেকে প্রশান্ত গম্ভীর,
সে সত্তায় ফিরে যেতে যে-সত্তায় হইনি প্রকাশ,
ফেরার নিশানা খোঁজা তলহীন সে গভীর থেকে
নিসর্গের সীমাহীন বৈচিত্র্যের মাঝে
আমার জীবন কিংবা মৃত্যু হোক মিছে; কিবা তাতে আসে যায়
একখণ্ড শিলা মাত্র হলে, নিকষ পাথর,
অনাবিল শিলা যাকে বুকে বয়ে নিয়ে যায় নদী।

# মাক্‌চু পিক্‌চুর উচ্চতা থেকে

[ একাদশ স্তবক ]

সমারোহ-উদ্ভূত কলরবে পথ ধরে ধরে,
শিলীভূত নিশীথের গাঢ় অন্ধকারে
আমাকে ডুবাতে দাও এ হাত আমার
ধীরে ধীর আঘাতে জাগাতে
আমার গভীরে থাকা একটি পাখিকে
হাজার বছর ধরে যাকে ধরে রাখা,
অতি পুরাতন সেই স্মৃতিলুপ্ত মানুষের প্রাণ !
আমাকে ভুলতে দাও এই এত সুখ,
সমুদ্রের যত ব্যাপ্তি তারও চেয়ে বড়,
যেহেতু মানুষ ব্যাপ্ত যাবৎ সমুদ্র আর তার কণ্ঠহার
যাবতীয় দ্বীপ তারও চেয়ে।
তারই মাঝে আমাদের নেমে যেতে হবে
ঠিক যেন কূপের গভীরে
কিনারায় ফিরে উঠে আসা
বহুশ্রমে মুঠি ভরে সে পবিত্র জল, আর
অব্যক্ত সত্যের শাখা ধ'রে।
আমাকে ভুলতে দাও পরিধি শিলার,
তার দৃঢ় সুসমতা, নির্জ্জেয় বিস্তার
মধুচক্ররূপী ভিত্তি আর
সমচতুর্ভুজ শিলা ধরে
এ হাত আমার, অবলীলাক্রমে যেন অবরোহী হয়
লোমশ পোশাক আর লবণাক্ত শোণিতের
অতিভুজ তলে।
রক্তাভ পাথর এক পতঙ্গের মত
ঠিক যেন অশ্বখুরে বেগে ঝড় তুলে
ক্রোধোন্মত্ত গৃধ্র তার ঊর্ধ্বগামী ডানায় যখন
আমার ললাটপ্রান্ত চূর্ণ করে আঘাতে আঘাতে
মাংসাশী পালকে তার ঘূর্ণিঝড়ে সরোষে তাড়ায়
ঘন কালো ধূলিকণা নিম্নগামী সোপানের পথে

পাখির সে তীব্রগতি মুছে যায় আমার দৃষ্টিতে,
কাস্তের মতন তার ভয়ঙ্কর বক্র নখগুলি
পুরাতন প্রাণগুলি জেগে ওঠে চোখের সমুখে—
ক্রীতদাস, যে মগ্ন নিদ্রায়,
আস্তৃত করেছে ভূমি—শব এক, বহু শব,
হাজার হাজার, নরদেহ, অগণিত নারী
অন্ধকার ঘূর্ণিঝড়ে নিক্ষেপিত যারা,
বর্ষা ও রাত্রিতে মিশে হয়েছে অঙ্গার,
শিলামূর্তি ভারে ভারে কঠিন পাথরে।
য়ুয়ান স্পিলস্টোনস, পিতা উইরাকোচা
য়ুয়ান কোল্ডবেলি, দায়াদ পান্নার
য়ুয়ান বেয়ারফুট, নীলাপুত্রোদ্ভব
জেগেছে আমার সাথে প্রাণের স্পন্দনে
সহোদর যেন তারা আপন আমার।

## ঐক্য

যেন নিহিত আছে কিছু নিচে, গভীরে—নিবিড় ও সমন্বিত।
যেন পুনরাবৃত্তি করছে তার সংখ্যা—তার অভিন্ন সংকেত।
পাথরগুলোর দেহে লেগে আছে সময়ের স্পর্শ,
তাদের অতিসূক্ষ্ম সত্তায় কেমন-এক কালের ঘ্রাণ,
সমুদ্র বাহিত জলেও লেগে থাকে লবণ ও স্বপ্নের স্বাদ।

আমি পরিবেষ্টিত এক ও অভিন্ন বস্তুতে, একটি মাত্র আন্দোলনে,
যত কিছু আকরিক পদার্থের ভার, ত্বকের ঔজ্জ্বল্য
যেন রাত্রি নামক শব্দটিকে আঁকড়ে ধরে :
গমের, গজদন্তের, অশ্রুর, চর্মনির্মিত দ্রব্যাদির
কাঠের, পশমের, বার্ধক্যের, ক্ষীয়মান বস্তুর, সমরূপী সত্তার কালিমা
সবই যেন মিলিত হয় দেয়ালের মত আমার চারধারে।

নিজেকে ঘিরে আবর্তিত হতে হতে নিঃশব্দে আমি কাজ করি
মৃত্যুকে ঘিরে যেমন করতে থাকে দাঁড়কাক, এক শোকসন্তপ্ত দাঁড়কাক।
আমি ধ্যানমগ্ন হই ঋতুর বিস্তারের মধ্যে—নিঃসঙ্গ, একাকী,
কেন্দ্রগত, শব্দহীন ভূগোল-পরিবেষ্টিত :
আকাশ থেকে নামে এক অসমাপ্ত তাপমাত্রা,
আমাকে ঘিরে জড়ো হয় এলোমেলো ঐক্যের এক চূড়ান্ত সাম্রাজ্য।

# পথে পথে ঘুরে

সহসা কেমন যেন ক্লান্ত লাগে মানবিক অস্তিত্বের ভারে
দৈবাৎ ঢুকে পড়ি দরজির দোকানে কিংবা চলচ্চিত্র গৃহে
নির্জীব নীরেট এক, পশমের রাজহাঁস যেন
মৌলিক সলিল আর ভস্মে নৌচালনে।

ক্ষৌরকার দোকানের গন্ধ যেন উচ্চরবে কাঁদায় আমাকে
একটু বিশ্রাম চাই পাথর আর পশমের থেকে
দেখতে চাইনা আর গৃহস্থালি অথবা উদ্যান
কপিকল তা-ও নয়, ব্যবসাও নয়, চশমাও।

কি জানি কেমন এক ক্লান্তি যেন দু'পায়ে জড়ায়
ক্লান্ত আমি নখগুলি নিয়ে, ক্লান্ত চুল নিয়ে
আমি এক ক্লান্ত নর, আমি নর তাই।

তবুও মজার হবে চমকে যদি দিই
ভয়ে ভয়ে ত্রস্ত সদা নোটারিকে কোনো
কিংবা রগে ঘুষি মেরে হত্যা করি কোনো সন্ন্যাসিনী
বড় চমৎকার হবে
একটা সবুজ ছুরি হাতে যদি পথে পথে ঘুরি
চীৎকার করতে করতে যতক্ষণ না মরে হই কাঠ।

চাইনা মূলের মত অন্ধকারে জন্ম বারবার
দ্বিধাগ্রস্ত, প্রসারিত, ঘুমঘোরে দুরুদুরু কাঁপা
নিম্নগামী, মৃত্তিকার প্রসিক্ত জঠরে
আত্মভূত, চিন্তান্বিত, প্রতিদিন আহার গ্রহণে।

আমি চাইনা সঞ্চিত এই দুর্ভাগ্যের উত্তরাধিকার
অনুবৃত্তি শিকড় বা কবরের মত
নিঃসঙ্গ সুড়ঙ্গ পথ, শবদেহ সমাকীর্ণ ঘরের মতন
অনড় কঠিন হিমে মৃতপ্রায় যেন।

আমাকে আসতে দেখে কয়েদির মত চেহারায়,
জ্বালানি তেলের মত সোমবারগুলি তাই জ্বলে
আহত চাকার মত যেতে যেতে গর্জমান
উষ্ণরক্তে সমাকীর্ণ গতি তার আসন্ন রাত্রিতে।

আমাকে সজোরে ঠেলে নিরালায়, কোনো কোনো স্যাঁতসেঁতে ঘরে,
হাসপাতালে, যেখানে জানালা দিয়ে হাড়গুলো যেন উঁকি দেয়,
ভিনেগার গন্ধযুক্ত কোনো কোনো জুতোর দোকানে
সেই সব রাস্তায় ফাটলের মত ভয়ঙ্কর।

গন্ধক-রং পাখি ঝোলান রয়েছে সব, ভয়াবহ
দরজায় দরজায়, সেই বাড়িগুলিতেই যেগুলি জঘন্য লাগে ভারী
কফিপাত্রে পড়ে আছে ভুলক্রমে একপাটি দাঁত
আরশিও আছে কিছু
কখনো কেঁদেছে ঠিক লজ্জায়, কখনো বা ত্রাসে,
ছড়ানো রয়েছে ছাতা সর্বত্রই, বিষ আর নাভিও অনেক।

আমি এগোতেই থাকি অবিচল, চোখ নিয়ে, জুতো নিয়ে,
প্রচণ্ড রোষ নিয়ে, বিস্মরণ নিয়ে
চলতেই থাকি আমি, অফিসের এক থেকে অন্য প্রান্তে, অর্থোপেডিক-শপে
বাড়ির উঠোন দিয়ে
যেখানে ঝুলছে তারে পোশাক-আশাক :
নিম্নাঙ্গের অন্তর্বাস, তোয়ালে ও শার্ট
ঝরছে যাদের চোখে
অশ্রুধারা—মলিন নীরব।

## স্মৃতি

আমাকে মনে রাখতে হয় সবই,
জানতে হয় ঘাসের শিষগুলোর কথা,
আঁতিপাতি নোংরা ঘটনার, বাড়িঘর, পুঙ্খানুপুঙ্খ
রেলের দীর্ঘ পথরেখা,
মুখ, যা মূর্ত বেদনা।

যদি একটি গোলাপ-ঝাড়কে ভুল হয়
রাতকে গুলিয়ে ফেলি খরগোস ব'লে
কিংবা একটা গোটা দেয়ালই যদি
ভেঙেচুরে থুবড়ে পড়ে স্মৃতিতে
পুরোটাই আমাকে গড়তে হয়
যেমন তেমনটি পুনরায়,
বাষ্প, পৃথিবী, পত্রালি,
চুল, এবং ইটগুলি পর্যন্ত,
যে কাঁটা আমার বিঁধেছিল তা
পালিয়ে যাওয়ার ক্ষিপ্রতাও।

একটু করুণা কর কবিকে।

আমি চিরকালই ভুলে যাই বড় দ্রুত
এই দুটি হাতে মুঠো ভ'রে
যা কিছু ধরেছি তার সবই
পরস্পর সম্পর্কবিহীন
শুধুই স্পর্শনাতীত
যার মিল পাওয়া যেতে পারে
হলে পর অস্তিত্ববিহীন।

ধোঁয়াকে লেগেছিল যেন সৌরভ,
সুরভিকে ধোঁয়ার মতন,
এক ঘুমন্ত দেহের ত্বক যা
জেগেছিল আমার চুমায় ;

তবে জানতে চেওনা ঠিক দিনটি
আমি পারিনা সে পথটাকে মাপতে
সে পথের নেই নাম নিশানা
অথবা সে সত্য যা এক নেই
দিন যাকে করেছে পরাস্ত
হয়তো বা জোনাকির মত
ইতস্তত একটি আলোক
অন্ধকারে উড়েছে পাখায়।

# আজ রাতে লিখে যেতে পারি

সবচেয়ে বেদনার কলিগুলি আজ রাতে লিখে যেতে পারি।

মনে কর, লিখলাম, 'রাত হ'ল ভেঙ্গে চুরমার
আর নীল নক্ষত্রেরা থরথর কাঁপে ঐ দূরে।'

গান গেয়ে রাতের বাতাস ঘুরে ঘুরে বেড়ায় আকাশে।

সবচেয়ে বেদনার কলিগুলি আজ রাতে লিখে যেতে পারি।
আমি তাকে বাসতাম ভালো, সে-ও ভালো বেসেছে কখনও।

এ রাতের মত কত রাতে তাকে বেঁধে রেখেছি বাহুতে।
অন্তহীন আকাশের নীচে বারবার করেছি চুম্বন।

সে আমাকে ভালোবেসেছিলো, কখনো বা আমিও তাকেও।
কে আছে না-ভালোবেসে পারে তার দীর্ঘ স্থির চোখ দুটি।

সবচেয়ে বেদনার কলিগুলি আজ রাতে লিখে যেতে পারি
এ ভাবনা—সে আমার নয়। এই বোধ—হারিয়েছি তাকে।

শব্দ শোনা বিশাল রাত্রির, সে-বিহীন আরও তা বিশাল।
তৃণক্ষেত্রে শিশিরের মত গান ঝরে মর্মের গভীরে।

কিবা তাতে আসে যায় যদি প্রেমে তাকে না-ই বেঁধে থাকি
চুরমার হয়েছে তো রাত, ঘর ছেড়ে সে গেছে হারিয়ে।

এই শুধু। কে গাইছে গান ঐ দূরে, দূরে বহুদূরে।
তাকে আমি হারিয়েছি তাই, অতৃপ্ত আমার হৃদয়।

দৃষ্টি তাকে খুঁজে ফেরে যেন তার কাছে যেতে চায় বলে
প্রত্যাশায় অন্তর ব্যাকুল কিন্তু সে তো ছেড়ে চলে গেছে।

ঠিক যেন সেই একই রাত, গাছগুলি তুষার ধবল
সেদিনের আমরা দুজন, তবু নই সেদিনের মত।

স্থির আমি, বুঝেছি এবার, তাকে ভালোবাসিনা এখন।
একদিন সারা মনপ্রাণে তবু ভালোবেসেছি কেমন।
কণ্ঠস্বর খুঁজেছে বাতাস তার কানে যেতে চুপিচুপি।

অন্য কারো। সে তো হবে আর এক জনার।
আমার সে চুমাগুলি পুরোনো দিনের।
তার স্বর। সমুজ্জ্বল কায়া। দু'নয়ন অনন্ত অপার।

তাকে ভালোবাসিনা এখন, স্থির জানি, হয়তো বা ভালোবাসি আজও
ভালোবাসা এত ক্ষণস্থায়ী, ভুলে যেতে এতদিন লাগে।

এ রাতের মত কত রাতে এ বাহুতে সে ছিল জড়ানো
তাই মনে সুখ নেই কোনো, বাহুদুটি আজ বড় একা।

তার দেওয়া সকল ব্যথার যদিও এ শেষ ব্যথা আজ
আর এই শেষ কলিগুলি তার জন্যে হ'ল সমর্পিত।

# মাদ্রিদে পৌঁছালো আন্তর্জাতিক প্রতিরোধ বাহিনী

একটি হিমশীতল মাসের সকাল,
যন্ত্রণাময় মাসের, কাদা ও ধোঁয়ায় মলিন,
সে মাসের জানু অশক্ত-অক্ষম,
অবরোধ আর দুর্ভাগ্যের এক বেদনাময় মাস।
আমার জানালার ভেজা শার্সিগুলোর অপর ধারে শোনা গিয়েছিল
আফ্রিকান শেয়ালগুলোর রাইফেলের গর্জন
রক্তমাখা ছিল তাদের দাঁতগুলো।

সেই যখন,
আশা বলতে আমাদের ছিল শুধু বারুদের স্বপ্ন,
আর আমাদের মনে হয়েছিল দুনিয়াটা শুধু
সর্বগ্রাসী রাক্ষস আর প্রতিহিংসার ডাইনীতে ছেয়ে গেছে,
তখন, মাদ্রিদের সেই হিমশীতল মাসের তুষার ভেদ করে
কুয়াশাবৃত সেই সকালে,
আমার এই দুটি চোখ দিয়ে দেখলাম,
এই জাগ্রত অন্তর দিয়ে দেখলাম,
দেখলাম, এলো সেই একরোখা জেদীরা, সেই দুধর্ষ সেনানীরা
কৃশতনু ও কঠিন, সুদক্ষ, উৎসাহদীপ্ত প্রস্তরদৃঢ় ব্রিগেড।

মর্মান্তিক সেই কাল, যখন রমণীরা
শূন্যগৃহে বইত বিরহজ্বালা জ্বলন্ত অঙ্গারের মত,
আর শস্যভূমিগুলি যা ছিল এতকাল গমের ঐশ্বর্যে পূর্ণ
তার আকাশে ভেসে বেড়াত স্পেনের যত মৃত্যুর ছায়া,
সকল মৃত্যুর তুলনায় যে মৃত্যু বহুগুণে বিস্বাদ ও তীব্র।

রাস্তায় রাস্তায় মানুষের রক্ত পড়ত ছড়িয়ে
তা গিয়ে মিশতো বাড়িগুলির বিধ্বস্ত অন্তর থেকে
নিঃসৃত দমকা জলস্রোতে।
ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিশুগুলির হাড়, অগণিত জননীর বুকভাঙ্গা শোকবিহ্বল নীরবতা
অসহায় মানুষের চিরদিনের মত মুদ্রিত চোখগুলি

যেন মূর্ত বিষাদ ও বিচ্ছেদ, বিনষ্ট উদ্যান,
আশা ও কুসুম যেখানে নিহত হয়েছিল অনন্তকালের মত।

কমরেড সব,
তখনই
আমি দেখেছিলাম তোমাদের,
কেননা আমি তোমাদের দেখেছিলাম এগিয়ে আসতে
কুয়াশাচ্ছন্ন কাস্তিলের নিষ্পাপ ললাটের দিকে,
নিঃশব্দ অথচ দৃঢ়,
প্রাক্-প্রত্যূষের গির্জার ঘণ্টার মত,
গাম্ভীর্য সমন্বিত নীল চোখ নিয়ে তোমাদের আসতে বহুদূর থেকে,
তোমাদের নিভৃত গৃহকোণ থেকে,
তোমাদের সম্পূর্ণ হারিয়ে যাওয়া দেশ থেকে,
উদ্দীপনাময় মাধুর্য ও বন্দুকের স্বপ্ন নিয়ে
স্পেনের এক নগরীর প্রতিরক্ষায়
কোণঠাসা মুক্তি যেখানে পশুর দংশনে দংশনে ভূলিণ্ঠিত,
মৃতপ্রায়।

ভাইসব, এখন থেকে চিরদিন
তোমাদের পবিত্রতা, তোমাদের শৌর্য, তোমাদের পবিত্র ইতিহাস
জানুক প্রতিটি শিশু ও প্রাপ্তবয়স্ক, নারী ও বৃদ্ধ,
এ যেন পৌঁছায় যারা আশাবিহীন তাদের সবার কাছে,
এ যেন নেমে যায় বিষাক্ত বাষ্পে ক্ষয়ে যাওয়া খনিগর্ভে,
এ যেন ঊর্ধ্বগামী হয় ক্রীতদাসের অমানুষিক সোপানে সোপানে,
যেন প্রতিটি নক্ষত্র, কাস্তিলের তথা নিখিল বিশ্বের
সকল শস্যমঞ্জরী লিখে রাখে তোমাদের নাম,
তোমাদের মৃত্যুপণ সংগ্রাম, আর শক্তিদীপ্ত
মর্ত্যভূমির একটি রক্তিম দেবদারুর মতই
তোমাদের বিজয়ের ইতিহাস।
কেননা তোমাদের আত্মবলিদানে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে হৃত আশা
মৃত আত্মশক্তি, মর্ত্যের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস,
আর তোমাদের প্রাণপ্রাচুর্যে, তোমাদের মহত্বে,
তোমাদের যত মৃত সেনানী তাদের বুকের উপর, ব'য়ে চলেছে
এক রক্তমাখা শিলাসংকুল উপত্যকার পথ ধরে
যেন এক মহানদী
ইস্পাত কঠিন শান্তিকপোত যার বুকে।

# খেলা কর তুমি প্রতিদিন

বিশ্বের আলো নিয়ে খেলা কর তুমি প্রতিদিন।
অতিথি অধরা, তুমি আস ফুলে, আস জলে।
নিবিড় বাঁধনে ধরা দুটি হাতে প্রতিদিন, এক গোছা ফুলের মতন,
এই পোষা কপোতের চেয়ে তুমি প্রিয়।

আমি ভালবাসি তাই অনুপমা তুমি।
এসো, আমি তোমাকে সাজাই রাশি রাশি হলুদ মালায়।
দক্ষিণের তারাদের কোলে কে লেখে তোমার নাম অস্পষ্ট অক্ষরে ?
দেখি আমি মনে পড়ে কিনা তোমাকে যেমন ছিলে অস্তিত্বের আগে।

বাতাস আঘাত করে সহসা হুঙ্কারে জানালার বন্ধ কপাটে।
আকাশের জাল ভ'রে ভিড় করে মেঘের মাছেরা।
তাদের সবারই পথ ছেড়ে দেয় এখানে হাওয়ারা, আগে কিংবা পরে।
বৃষ্টি এসে খুলে দেয় আচ্ছাদন তার।

পাখিরা উধাও হয়, পালায় ভয়েতে।
হাওয়া বয়, হাওয়া।
মানুষের ক্ষমতার প্রতিকূলে যুঝে যেতে পারি শুধু আমি।
ঝড় দূরে ছুঁড়ে দেয় কালো পাতাগুলো
খুলে দেয় তরীগুলি যারা ছিল কাল রাতে আকাশে নোঙর।

এখানে রয়েছ তুমি, তুমি বুঝি যাওনি পালিয়ে।
সবশেষ ডাকটিতে আমাকে জানাবে সাড়া তাই।
যেন সন্ত্রাসে ভয়ে পাকে পাকে আমাকে জড়াবে।
যেমনটি একদিন, সহসা তোমার চোখে বিঁধেছিল অপরূপ ছায়া।

আজ, আজও, প্রিয়তমা, নিয়ে এলে মালতীর ফুল,
তোমার স্তনেও যার গন্ধ মাখা আছে।
বেদনা সঘন হাওয়া ঐ বয়, প্রজাপতি মরে ঝাঁকে ঝাঁকে
আমি ভালোবাসি তো তোমাকে,
কিসমিস যেন ঐ অধর তোমার তাই কামড়াই সুখে।

আমাকে মানাতে গিয়ে কত যে দুঃখ তুমি সয়েছ নিশ্চিত,
আমার আদিম আর নিঃসঙ্গ প্রকৃতি তাই নাম শুনে পালায় সবাই।
কতদিন আমরা দেখেছি শুকতারা জ্বলজ্বল জ্বলে, চুমু দেয় আমাদের চোখে,
আমাদের মাথার উপর ধূসর আলোক অবিরত পাক খায় পাখার মতন।

বর্ষা হয়ে আমার কথারা ঝরেছে তোমার গায়ে, যেন বুলিয়েছি হাত
তোমার শরীরে ধীরে ধীরে।
রৌদ্ররঙ মুক্তার মত তোমার ঐ দেহটাকে ভালোবাসি যুগ যুগ ধরে।
এতদিন পরে, এবার জেনেছি তাই এ-বিশ্বের অধীশ্বরী তুমি।

খুশি ঝলমল ফুল পাহাড়ের থেকে আমি এনে দেব তোমাকে ব্লুবেল,
বাদামী হেজেল ফুল, তার সাথে ঝুড়ি ঝুড়ি অভব্য চুম্বন।
আমি চাই
বসন্ত যে-খেলা করে চেরী গাছে গাছে
তেমনি তোমাকে নিয়ে খেলি।

## ওরা এলো দ্বীপগুলো দখল করতে ( ১৪৯৩ )

কসাইগুলো বিধ্বস্ত করেছিল দ্বীপগুলি,
গুয়ানাহানির নামটিই প্রথম
সেই অত্যাচারের ইতিবৃত্তে।
কাদার মত কোমল শিশুগুলির
মুখের হাসি গিয়েছিল গুঁড়িয়ে,
হরিণের মত লঘু-চকিত পায়েই দাঁড়িয়েছিল তারা
কিন্তু আঘাত এসেছিল বারবার আর নির্মম
যতক্ষণ না মরেছে তারা, যে মৃত্যুর 'কেন' তারা বুঝতেও পারেনি।

তাদের ওরা বেঁধেছিল একসাথে আঁটি ক'রে
তারপর করেছিল নির্যাতন,
জ্বালিয়েছিল তাদের, পুড়িয়েছিল,
তিলে তিলে শুকিয়ে মেরেই দিয়েছিল কবর।
তারপর সময় যেদিন আবার
ওয়াল্‌জ নাচের খুশিতে উঠেছিল নেচে
তালতমালের বনে বনে
সেই সবুজ কক্ষটি তখন ফাঁকা—জনশূন্য।

শুধু হাড়গুলোই পড়েছিল অবশিষ্ট
আঁট করে বাঁধা ক্রুশের মতন—
ঈশ্বর ও মানুষের
মহত্ত্বর গৌরব ঘোষণায়।

প্রধান প্রধান মৃত্তিকাগর্ভ
আর সোতোভেন্তোর সবুজ শাখাগুলি থেকে
নীচে অতি ক্ষুদ্র প্রবাল দ্বীপগুলি পর্যন্ত
নারভেজের ছুরি টুকরো টুকরো করেছিল কেটে।
ঐ দ্যাখ, রেহাই পায়নি ক্রুশ, রেহাই পায়নি গির্জায় প্রার্থনার মালাটি,
কুমারী জোনের দণ্ডবিদ্ধ মূর্তিটিও।

প্রদীপ্ত কিউবা, কলাম্বাসের হীরে-পান্না,
হাতে নিশান পেল মুক্তির
ভিক্ষালব্ধ,
নতজানু তার রক্তে ভেজা বালিতে।*

* ১৯০২ সালে মার্কিনদের কাছ থেকে পাওয়া শর্তাধীন স্বাধীনতাই সম্ভবত কবির উদ্দিষ্ট। ১৯৫৯ সালে ফিদেল কাস্ত্রোর অর্জিত স্বাধীনতা নয়।—অনুবাদক

# মৎস্যকন্যা ও পানোন্মত্তদের উপকথা

ঘরের ভিতরটা জমজমাট ওদের আড্ডায়
ও এসে ঢুকলো : বিবস্ত্র, নগ্ন।
ওরা তখন পানোন্মত্ত, বারবার থুথু দিল ওর গায়ে।
ও সবে এসেছে নদীর গভীর থেকে—কিছুই বুঝল না তাই।
ও ছিল এক জলকন্যা—হারিয়েছিল পথ।
ওদের বিদ্রূপ যেন ব'য়ে চলছিল ওর মসৃণ শরীরটাকে ঘিরে
ওর সোনালী স্তন দুটিকে ঘিরে ন্যক্কারজনক ইতরামি
ও জানেনা কান্না কি, কাঁদল না তাই।
ও জানেনা বস্ত্র কি, নিরাবরণ ছিল তাই।
পোড়া ছিপি আর পোড়া সিগ্রেট দিয়ে ওকে উত্যক্ত করল ওরা,
আর হাসির হুল্লোড়ে গড়াতে লাগল সরাইখানার মেঝেতে।
ও রইল নীরব, ও তো কথা বলতে জানেনা।
ওর চোখে ছিল সুদূরের ভালোবাসার রং,
ওর বাহুদুটিতে পোখরাজের বাজুবন্ধ।
ওর ঠোঁট দুটি নিঃশব্দে কেঁপে ছড়িয়ে দিল প্রবালের জ্যোতি,
আর অবশেষে ঐ দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ও।
আর নদীতে নামতে না নামতেই দেহ হ'ল ক্লেদমুক্ত
বর্ষা-ধোওয়া শ্বেতপাথরের মত পুনরায় উজ্জ্বল ;
ও একটিবারও পিছনে ফিরল না আর,
ও আবারও সাঁতার দিল,
সে সাঁতার অনস্তিত্বের দিকে
সে সাঁতার মৃত্যুর আঁধার।

## থেমে যায় নদী কলতান

শোন বলি তোমাকে, আমি একদিন গিয়ে পড়েছিলাম সেই অঞ্চলটিতে
বড় ভয় করছিল মনে
রহস্যঘন শব্দে যেন জেগেছিল রাতের বুকে আলোড়ন
আর সেই বিস্ময়ভরা বিশ্বে আমি পৌঁছেছিলাম
এক ট্রাকে চেপে গুটিসুটি কোনমতে।
তিমিরাচ্ছন্ন এশিয়া, তমসানিবিড় অরণ্য, পবিত্র চিতাভস্ম,
মক্ষিকার ডানার মত আমার যৌবন
ছুটেছিল দুর্বার বেগে স্থান থেকে স্থানান্তরে
সেই অপরিজ্ঞাত রাজ্যময়।

অকস্মাৎ থমকে দাঁড়িয়েছিল চাকাগুলি, অচেনা যারা তারা গিয়েছিল নেমে,
আর আমি, এক পরদেশী, সেই নির্জন অরণ্যে
পড়ে রইলাম নিঃসঙ্গ, অসহায়ের মত অন্ধকারে পড়ে থাকা সেই ট্রাকে,
বিশ বছরের যুবা, মৃত্যুর অপেক্ষায়, বাক্শক্তিহীন সংকোচনে।

সহসা বেজে উঠেছিল দামামা, জ্বলে উঠেছিল মশাল, উত্তেজনামুখর এক মুহূর্ত,
আর আমার হত্যাকারী ব'লে সুনিশ্চিত ভেবেছিলাম যাদের
তারা শুরু করেছিল নৃত্য, অরণ্যের সর্বব্যাপী অন্ধকারে,
এক ভিন্‌দেশীর চিত্তবিনোদনে, যে পথভ্রষ্ট এসে পড়েছিল ঐ দূরাঞ্চলে।

তাই, এতসব অশুভ সংকেত যে মুহূর্তে সূচনা করছিল আমার জীবনাবসান,
তখন বিশাল দামামা, উদগত ফুলের মত থোকা থোকা চুল, আলোয় ঝল্‌কে
ওঠা পায়ের গোড়ালি, মুখর হয়েছিল নাচে এক বিদেশীর অভ্যর্থনায়—
মুখে মৃদু হাসি আর কণ্ঠভরা গান নিয়ে।

এ কাহিনী তোমাকে শোনাই প্রিয়তমা, কেননা সেই শিক্ষাটি,
সেই মানবিক শিক্ষা, প্রতিভাত হচ্ছে এর ছদ্মবেশের আড়াল থেকে
আর সেখানেই আমার চিত্তে বদ্ধমূল হয়েছিল অরুণোদয়ের মূল সত্য—
সেখানেই আমার মন জেগে উঠেছিল বিশ্বভ্রাতৃত্বের চেতনায়।

এটা ঘটেছিল ভিয়েৎনামে, উনিশশত আঠাশের ভিয়েৎনাম

চল্লিশ বছর পরে, আমার সেই সঙ্গীসাথীর সঙ্গীতের আকাশে
নেমে এলো নরহত্যার বিষবাষ্প, পুড়ে গেল সেই পায়ের পাতাগুলি,
পুড়ে গেল গান, দগ্ধ হ'ল অরণ্যের প্রবহমান নীরবতা,
বিস্ফোরণে উড়ে গেল ভালোবাসা, চূর্ণবিচূর্ণ হ'ল শিশুদের শান্তি।

'বর্বর হানাদার নিপাত যাক্ নিপাত যাক্', আজ ধ্বনি তুলছে দামামা
যে ধ্বনি সংহত করেছে
ক্ষুদ্র দেশটিকে প্রতিরোধের মৈত্রীবন্ধনে।

হে প্রিয়তমা, তোমাকে বলেছি যা কিছু ঘটেছিল সাগরে, সেইদিন
জলে ঝিমিয়ে পড়েছিল চাঁদ কল্লোলিত সাগরের বুকে,
আমার সামঞ্জস্যের রীতিবোধ এমনি করেই সাজিয়েছিল তাকে
সামুদ্রিক বসন্তের প্রথম চুম্বনের শিহরণে।
আমি বলেছি তোমাকে--যখন নিয়ে বেড়াই সাথে সাথে তোমার ঐ চোখের চাহনি
আমার বিশ্বপরিক্রমার পথে পথে
আমার অন্তরে নিহিত গোলাপকুঁড়ি রচনা করে তার প্রস্ফুটনের বেদীমূল
এও বলেছি আরও, স্মৃতির সঞ্চয় থেকে তোমাকে দিলাম দুর্বৃত্ত আর বীরদের উপহার
আমার চুমার গভীরে ধ্বনিত হয়ে ওঠে সারা বিশ্বের মেঘমন্দ্র—
এমনি করেই তরণী তার নোঙর খোলে আমার কল্লোলিত সমুদ্রে।

কিন্তু কলঙ্কিত এই বছরগুলি, আমাদের এই কাল ; বহুদূরে
কত মানুষের রক্ত আজও কত না নেমে আসছে ফেনায়িত সমুদ্রে,
তার ঢেউগুলি আমাদের দেয় কলঙ্কের ছাপ, যে কলঙ্ক লেগেছে চাঁদেও।
দূরান্তের সেই যন্ত্রণাকাতর ধ্বনি আমাদেরও যন্ত্রণা
নির্যাতিতের জন্যে লড়াই আমার অস্তিত্বে—অস্থিতে মজ্জায়।

হয়তো একদিন শেষ হবে এ লড়াই যেমন গিয়েছে অন্য লড়াইগুলো
আমাদের দ্বিধা বিভক্ত ক'রে, আমাদের মৃত্যুতে নিশ্চিহ্ন ক'রে,
আমাদের নিহত ক'রে, তার সাথে যারা হত্যাকারী তাদেরও।
তবুও এই ঘৃণিত কালের কলঙ্ক আমাদের মুখে এ'কে দিল
তার দগ্ধ আঙ্গুলের ছাপ।
কার সাধ্য মুছবে সেই দুরপনেয় নির্মমতা—
যা লুকিয়ে আছে নিষ্পাপ রক্তের গভীরে ?
হে প্রিয়তমা, উন্মুক্ত উপকূল-প্রান্ত জুড়ে
পৃথিবী তার সৌরভ ছড়ায় পাপড়ি থেকে পাপড়িতে
আজ বসন্ত তার কেতন উড়িয়ে ঘোষণা করছে
মানুষের অমরতা, ক্ষণভঙ্গুর, তাই আরও বেদনাময়।

এ তরী যদি আর বন্দরে নাই ফেরে ক্লান্তিহীন দাঁড় টেনে
জলকল্লোল যদি আপনমনে মিশে যায় মন্দ্রিত সাগরে
তোমার সোনালী কটি যদি সুষমায় ভ'রে ওঠে আমার দুহাতে
তবে এসো, নতশিরে মেনে নিই সমুদ্রেই ফিরে যাওয়া—
আমাদের অব্যর্থ নিয়তি।
অর্থহীন হৈ চৈ ছেড়ে, এসো মেনে নিই সমুদ্রের মেজাজী খেয়াল।

কে পারে মেলাতে সুর তার সাথে
প্রবাহ ও পারম্পর্যে যে-রহস্য আছে,
যে-রহস্য ভ'রে দেয় জীবনের দিনগুলি সূর্যালোকে, অতঃপর বেদনায়,
অনুক্রম সারে ?
সর্বশেষ শাখা থেকে যে পাতাটি নুয়ে পড়ে সুমহান পৃথিবীর বুকে
হলুদ বাতাসে ঝ'রে
সূচনা সে করে যেন এক আবির্ভাব।

যন্ত্রের নির্মাণে মত্ত মানুষেরা শিল্পসামগ্রীকে
করেছে কুৎসিত, তার আঁকা ছবিগুলি, তারে-গড়া প্রতিমূর্তি বড় কামনার,
তার গ্রন্থ, তাও চায় সত্যের বিদ্যুৎচ্ছটা ঢেকে দিতে মিথ্যার কালিতে ;
ধানক্ষেতে কাদাজলে ছাপ ছাপ রক্তেলেখা ব্যবসার লেনদেন চলে
বহু মানুষের আশা মরে যায়, চিহ্ন যার পড়ে থাকে বিশীর্ণ কঙ্কালে।
আর ওরা পৌঁছে গিয়ে চাঁদে রেখে এল বহুমূল্য হাতিয়ারগুলি
আমরা যে শিশুগুলি অজ্ঞান তিমিরে আছি কখনো তা জানিনা আদৌ
আবিষ্কৃত সে বস্তুটি নবতর গ্রহ কিংবা অভিনব মৃত্যুর নমুনা।

আমার নিজের কথা, তোমারও তা বটে, আমরা মেনেছি,
আশা আর ব্যর্থতাকে ভাগ করে নিয়েছি দুজনে
আমরা আহত নই শুধুমাত্র মৃত্যুদায়ী শত্রুর আঘাতে
প্রাণঘাতী মিত্ররাও আঘাত করেছে ( আরও বুঝি মর্মভেদী তাই ),
রুটি বুঝি স্বাদ তার ফেলেছে হারিয়ে, আমার গ্রন্থও—এর মাঝে,
বেঁচে থেকে যে-যন্ত্রণাগুলি,
যন্ত্রণারও হাতে নেই তার পরিসংখ্যান কোনো
ভালোবেসে যাই প্রিয়তমা, আমাদের সুস্পষ্ট প্রকাশে
মিথ্যাবাদীদের সব দিয়েছি কবর, তাদের শরিক হয়ে বেঁচে আছি
সত্যবাদী যারা।

প্রিয়তমা, রাত নামে, অতি দ্রুত সসাগরা ধরিত্রীকে ঘিরে।

প্রিয়তমা, রাত এসে মুছে দিল সাগরের সব চিহ্নটুকু,
নৌকার গলুইগুলি ঘুমায় বিশ্রামে।

প্রিয়তমা, রাত জ্বালিয়েছে দীপ দূরে তার নক্ষত্রভবনে।

নিদ্রামগ্ন পুরুষের শয্যার কিনারে
অবলীলাক্রমে নারী নেমে এল বিনিদ্র নয়নে
স্বপ্নপথে দুজনাতে নামে সে নদীতে যা মিশেছে অশ্রুর সাগরে।
আরো একবার তারা মিশে যায় আলোহীন প্রাণীদের সাথে
বাষ্পযান ঠাসা ভিড়ে অশরীরী ছায়াদের দলে
অস্তিত্বের সেই প্রান্তে যার কোন অর্থ নেই
অন্ধকারে দ্যুতিহীন পাথরের চেয়ে।

সময় হয়েছে প্রিয়া, চুরমার করবার বিষণ্ণ গোলাপ,
তারাগুলি নিভানোর, ভস্মরাশি পুঁতে তার ধরার মাটিতে ;
তারপর আলোর উদয়ে, সাড়া দেওয়া জেগে-থাকা মানুষের ডাকে
নয়তো বা ডুবে যাওয়া স্বপ্নের অতলে,
পৌঁছে যাওয়া সমুদ্রের অন্য এক কূলে
যার কোন পার নেই আর।

## কিছুতেই ভোলা যায় না

যদি প্রশ্ন কর কোথায় ছিলাম
আমাকে বলতেই হবে—'ঘটে অনেক কিছুই'।
আমাকে বলতেই হবে সেই পাথরগুলোর কথা যারা ছায়ায় ঢাকে ধরণীকে
সেই নদীটির কথা চলতে চলতে নিজেকে নিঃশেষ করেছে যে,
আমি শুধু সেগুলির কথাই জানি যা পাখিরা ফেলেছে হারিয়ে
সেই সমুদ্র যাকে ফেলে এসেছি পিছনে
অথবা আমার বোনটি যে এখনো কাঁদছে—তাকে।
এই এত দেশ—কেন ? কেনই বা এই একটি দিন অন্যদিনে জোড়া ?
কালো রাত কেনই বা জমে ওঠে মুখের ভিতর
এত—এত মৃতই বা কেন ?

আমাকে যদি প্রশ্ন কর কোথা থেকে এলাম
তবে বলতে হয়—ভাঙ্গাচোরা জিনিসগুলোর কথাই
তেতো লাগা বাসনগুলোর কথাই
ইয়া ইয়া পশুগুলির কথাই
প্রায়শই যারা মরে আর মিশে যায় ধুলোয়।
আর বলতে হয় আমার এই শোকার্ত হৃদয়ের কথা।

এই স্মৃতিগুলি কিন্তু প্রতিচ্ছেদী নয়—বিরোধী নয় একে অন্যের,
বিস্মৃতির তলায় ঘুমিয়ে পড়া হলুদ ছোপের পায়রাও এরা নয় ;
এগুলি মুখ, যেখানে অশ্রু ঝরে অঝোরে,
এগুলি অঙ্গুলি, প্রবিষ্ট কণ্ঠনালীতে,
আর যা কিছু ঝরে ফোঁটায় ফোঁটায় গাছের পাতা থেকে,
দিন অবসানে নেমে আসে যে আঁধার—এরা তারা
যে দিনটি আমাদের বেদনার রক্তপানে স্ফীতকায়।

চেয়ে দ্যাখো ঐ ভায়োলেট ফুলগুলো, দ্যাখো ঐ সোয়ালোগুলোকে,
আমাদের যা কিছু প্রিয়, যারা বার্তা বয়ে আনে মনোলোভা
তাদেরই ধারাপথ ধ'রে
যেন যায় আর আসে সুন্দর, মনোহর।

নাইবা গেলাম অতদূরে দাঁতের বেড়া ডিঙিয়ে,
কি হবে জাবর কেটে নৈঃশব্দের জড়ো করা এত খোসা নিয়ে,
কেননা আমিতো জানিনা কি উত্তর দেব :
এত মৃতদেহ কেন—এত মৃত,
কেন লাল সূর্যটা খাদে খাদে ফাটায় মাটিকে
আঘাতে আঘাতে চূর্ণ এত মাথা জাহাজের তলে
কেন এতগুলি হাত, চুমাগুলি কেন ঢেকে দিতে
আর এই এত সব—এত সব চাই ভুলে যেতে।

# জাগো রেলের কাঠ-চেরাই দল

[ অংশ বিশেষ ]

এবার বিদায় নেওয়া,
ঘরে ফিরে যাওয়া,
ফিরে যাই স্বপ্নে সেই পাতাগোনিয়ায়
অবিরত প্রগলভ হাওয়ারা
গোলাবাড়ি ঘিরে বয় যেখানে যেদেশে,
ইতস্তত বরফ ছড়ায় সমুদ্র নিজেই।
আমি শুধু কবি এক, তার বেশি নই :
তোমাদের ভালোবাসি—এই,
ঘুরি আমি পৃথিবীটা জুড়ে—
প্রিয় এই পৃথিবী আমার।
আমার আপন দেশে
খনির শ্রমিক পায় শুধু কারাবাস
বিচারপতিরা চলে ফৌজের হুকুমে।
তবু ভালোবাসি আমি ছোট সেই হিমেল দেশের
শিকড়গুলিও,
যদি মরি হাজার বারও
তথাপি মরতে চাই, সে দেশেই, মাটিতে আমার,
হাজার হাজার বার জন্ম হয় যদি
আমি যেন জন্মাই সেখানে।
অরণ্যের দীর্ঘ দেবদারু—তারই ধারে,
দক্ষিণের ঝড়ের হাওয়ায় আলোড়ন জাগে—সেই দেশে,
যে-দেশ মুখর হয় আনকোরা ঘণ্টার ধ্বনিতে—সেইখানে।
আমার একার কথা আর কেউ ভেবনা এখন।
এসো ভাবি, পৃথিবীর কথা
এই যে রেখেছি হাত টেবিলে এখানে
তা যেন স্পন্দিত হয় সে ভালোবাসায়।
আর রক্ত নয়—
চাইনা রক্তে ডোবা রুটি, বিন, গান :
আমি চাই আসুক সবাই—

আসুক আমার সাথে খনির শ্রমিক,
ছোটমেয়ে, উকিল, নাবিক,
আসুক পটুয়া শিল্পী, চলচ্চিত্র দেখব সবাই,
ফিরে এসে পান করব সুরা গাঢ় লাল।
কোনো সমাধানসূত্র আনিনি তো আমি
আমি গান গাই
আর ডাকি তোমাদের—সকলে মিলাও গলা আমার গলায়।